রূপ হ'তে অরূপে

শ্রীমৃণালকান্তি দাশগুপ্ত

অশোক পুস্তকালয় পুস্তক-বিক্রেতা
৬৪নং হ্যারিসন রোড় • কলিকাতা -৯

দু'চার কথা

বাঙলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে তথা ধর্ম-জগতের বিস্তৃত পরিধিতে যাঁরা রূপের সাধনার ভেতর দিয়ে পেয়েছিলেন অরূপের সন্ধান, আলোচ্য গ্রন্থে তাঁদের কথাই বলা হয়েছে।

কবি ক্রান্তদর্শী। তাঁর অন্তর-দৃষ্টির রশ্মি-শলায় আগামী পৃথিবীর সব-কিছু প্রতিভাসিত হয়ে থাকে। তিনি শুধু সৃষ্টির আনন্দে তন্ময় হয়ে ডুবেই যান না। তিনি দ্রষ্টাও বটে। এই দৃষ্টির সীমাকে, এই সসীম সাক্ষাৎকে রূপের ভুবন বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। রূপ ও অরূপ। প্রথমে দর্শন। পরশন। তার পরে আত্মস্থ ভাব। তদ্গত চিত্ত। তখন বাইরের দরজায় খিল পড়ে ভেতর দুয়ারটা খুলে যায়। কবি তখন একাধারে দ্রষ্টা ও স্রষ্টার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে মনোগেহে বিরাজ করেন। এবং এক অখণ্ড সত্যের সায়র-উপকূলে দাঁড়িয়ে প্রত্যক্ষ করেন সেই মহা প্রবাহকে। সাহিত্যের সত্যও এই অখণ্ড প্রবাহের মধ্যেই বেঁচে থাকে বলে আমার বিশ্বাস।

এ কথাটা অবিশ্যি সাধক জীবনের বেলায়ও বলা চলে, কারণ তাঁরাও অখণ্ড সত্য উপলব্ধির পথে আত্মরতির সুখ সায়রে ভেসে ভেসে এসে উপনীত হয়েছেন অদ্বয় অখণ্ড এক সত্তা-তীর্থে। সেখানে আর রূপ নেই, অরূপ রতন। কবি বলেছেন—

রূপ সায়রে ডুব দিয়েছি
অরূপ রতন আশা করি।

সাধক শ্রীরামকৃষ্ণের মুখেও অনুরূপ উক্তি শোনা গিয়েছে। তিনি বলেছেন—'ভিতরেই তো সব।···বাইরে দেখার সাধ মেটাতেই তো বাইরে আসেন ওঁরা।···সবই অন্তরে। সবই হৃদয়-মন্দিরে। দেহই তো দেবালয়। আর তা শুধু আমারই নারে, তোর···আমার,···সকলের।'

বাউল ভক্ত মুর্শীদের অনুরাগে কেঁদে কেঁদে বললে—

'ওপারে আমার মুর্শীদের বাড়ি
এপারে বসে কান্দি আমি রে।'

'এপার' আর 'ওপার'। দুইয়ের মাঝে ব্যবধানটুকু কালগত নয়—এ-কে বলা যেতে পারে কবিগত রস। যেমন বীজ থেকে উৎপত্তি হয় বৃক্ষের। বৃক্ষ থেকে পুষ্প এবং ফলে তার পরিণতি, এ রূপের জগৎ থেকে 'ওপারের' ঐ অদৃশ্য অজ্ঞেয় অরূপ তীর্থে উত্তোরণ হলেই বলা যেতে পারে রূপের পরিণতি লাভ। কবি বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসকে পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে আমি এ বিষয়টি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছি বলেই এখানে ও প্রসঙ্গ তুলে পাঠকমনের 'পর বোঝা চাপালেম না। সৃষ্টির গতি-তত্ত্বের মধ্য দিয়ে এই রূপের ভুবনে বিহার করতে করতেই সেই চিরন্তনের বেশ সুন্দর একটি থেই ধরে বসে। সে চাওয়ারই নামান্তর বলতে হবে। কারণ রূপ আর অরূপের মাঝের যে ফাঁকটুকু তা যেন তখন কবি-মনের কাছে অসহ্য। তিনি তখন এই খণ্ড সৌন্দর্যের মাঝেই অখণ্ড রূপের প্রকাশ কামনা করে উদ্গত হয়ে ওঠেন। এবং সীমার মাঝে অসীমকে টেনে নিয়ে আসেন।

এ গ্রন্থের কয়েকটি প্রবন্ধ যথাক্রমে যুগান্তর, হিমাদ্রি এবং যুগ ও জীবনে প্রকাশিত হয়েছিল। এবারে তারই একটি গ্রথিত রূপ তুলে ধরা মাত্র। আমার যুক্তি-বিচার অভ্রান্ত এ কথা বলবার স্পর্ধা আমার নেই। তবে এ বই পড়ে যদি পাঠক সাধারণ এতটুকুও আনন্দ পেয়ে থাকেন, তবেই মনে করব শ্রম আমার বৃথায় যায়নি। সার্থক হয়েছে আমার কীর্তন।

বিনীত

মৃণালকান্তি দাশগুপ্ত

পরম শ্রদ্ধেয় রামতনু অধ্যাপক,

ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্তের করকমলে

স্নেহার্থী

মৃণালকান্তি

সূচীপত্র

শানাল ফকিরের মুর্শীদ্যা গান

পদ্মা, মেঘনার জল-বেষ্টনী। দিগন্তবিসারী সবুজ-লক্ষ্মীর সর্বঢালা স্নেহ। আম, জাম, তাল, তমালের ঘন-বিস্তার। রাশি রাশি কুসুম ছড়ান' শয্যা। সবুজ ঘাসের নবনীত গালিচা। তারই কোল ছুঁয়ে যেত পদ্মা, মেঘনার খর-শীতল প্রবাহ। সজীব হয়ে উঠত মাটির মরম। গ্রামের হৃদয়-বৃন্দাবনে জেগে উঠত বিরহের কান্না। সুর পেত' তা গানে।

সেত কত কালের কথা। কিন্তু আজও মনের নিভৃত নিকেতনে সাড়া জাগিয়ে যায় জল-বাঙ্‌লার সুরভিত হাওয়া। মন ওঠে চন-মন করে। ছুটে যাই অতীতের মায়া-লোকে। মনে হয় স্বপ্ন। তবুও রুদ্ধ করে দেই বাইরের দুয়ার। খুলে বসি অন্তরের সিংহদ্বার।

গ্রামের 'পর দিয়ে চলে গিয়েছে কত কান্না। পদ্মার ওপার থেকে ভেসে এসেছে গেঁয়ো চাষার কান্না-করুণ আর্তি। বিরহী বেহুলার হৃদ্‌বিদারণ কণ্ঠ দিয়েছে সজাগ করে গ্রামের 'ধোনা', 'মনাকে'। নিশীথ রাত্রির নিদ্রাকে কেড়ে নিয়েছে 'আমীর সাধুর' সারিন্দার সুর। নীরবে চোখের জল ফেলেছে গ্রামের বনকন্যা। মেগেছে প্রবাসী পতির কুশল অশ্রু-আতুর নয়নে নীল-নিঃসীম আকাশ পানে তাকিয়ে। গ্রাম ভোলেনি সে-কান্না। তার মৃৎকোষে প্রাণিত হয়ে রয়েছে 'কেচ্ছা'। 'বারোমাসী' ও 'রাখালী' সঙ্গীত। একদিন এ সুর এনে দিয়েছিল গ্রামের

বুকে ‘তন্‌হা’। অতৃপ্তির ক্লিষ্ট কান্না জাগিয়ে দিয়েছিল অন্তরে। বাইরের সুর এসে আঘাত করেছিল হৃদয়বীণায়। অমনি বেজে উঠেছিল বাউলের সারিন্দা—

‘তুমি দাও দেখা দয়াল চান্‌ আমারে—
তুমি কও কথা সোনার চান্‌ আমারে
তোমারে না দেখিলে প্রাণ আমার বাঁচে না রে।’

বহিরঙ্গ মন উঠেছিল সে দিন অন্তরঙ্গ হয়ে। খুঁজে পেয়েছিল গেঁয়ো চাষি তার ‘দয়াল চান্‌কে’ হৃদয়ের দেউলে। নিয়ে এসেছিল তাঁকে গ্রামের ছায়া ঘন পরিবেশে। নিয়ে এসেছিল একান্ত কাছের করে। কোন তত্ত্ব জ্ঞানের মিনারে বসে তারা তাদের প্রেমময়কে ডাকল না। খুঁজতে গেল না মনোময়কে রুদ্ধ দেবালয়ের কোণে। বেদনার অশ্রু ফেলল কেবল তারা মাঠে, ঘাটে, পথে ও প্রান্তে। আকুল কণ্ঠে আহ্বান করল সুন্দরকে। জাত, মানের ভয়কে দিল নির্বাসন। ভেদ-বিভেদের পাঁচিল ফেলল ভেঙ্গে। হিন্দুর শিষ্য হোল মুসলমান। আবার মুসলমানের শিষ্য হোল হিন্দু। পরস্পরে নেমে এলো, নেমে এলো মুক্তির দিগন্তে, শান্তির তপ-তীর্থে। এ পথের পথিক হিসেবে আমরা মুর্শীদ্যা সম্প্রদায়টিকেও পেয়েছিলাম পল্লীর নিভৃত ছায়া-মেদুর বনপথে।

কবে কোন স্বর্ণ-প্রভাতের অরুণোদয়ে যে ধ্বনিত হয়েছিল, মুর্শীদের বন্দনা গান ভক্ত সাধকের কণ্ঠে, তা বলা কঠিন। তবে অনুমান করা যায় যে, তিনশত বছর পূর্বেও এ গান ছিল গ্রামের একান্ত অন্তরের সম্পদ। শুধু তিনশত বছর কেন, হয়তো আরও প্রাচীন আরও অতীতের সাক্ষ্য বহন করছে এ সঙ্গীত।

বৌদ্ধ প্রভাব থেকে সে দিনের গ্রাম ছিল না মুক্ত। মায়াবাদ ও কায়া-সাধনের ছোঁয়া লেগেছিল গ্রামের বুকে, যুগের জীবনে। জীবের জনতায় সর্বত্যাগী সাধক এনে দিয়েছিল পরাবৃত্তির ভাব। মানুষের

মন চ'লে ছিল স্রোতের উজানে। উল্টা সাধন পথে। এ ভাব মুর্শীদ্যা সম্প্রদায়টির মধ্যেও পুরোপুরি দেখা যায়। মন চলত' তাদের অনন্তের অভিসারে, কিন্তু আশ্রয় করেছিল শ্রীগুরুর পাদপদ্ম। গুরুকে ধ্যান করেই এগিয়ে যেত তারা চিন্তামণির মন্দিরের দিকে। আর এ কেমন ধ্যান? নীরবে নয়ন মুদে রুদ্ধ ঘরে বসে নয়, সারিন্দার সুরে মনের কান্নাটি মিলিয়ে দিত ভক্ত। অন্তরে জ্বলত বিরহের দহন-জ্বালা। বুক-ফাটা কান্নায় ভাসিয়ে দিত দুটি নয়ন। মনের মানুষটির তালাসে কেঁদে কেঁদে বলত বাউল—

'আমার মনের মানুষ যেরে—
আমি কেবল খুঁজি তাঁরে।'

মুর্শীদ্যা গানেও অনুরূপ পঙ্‌ক্তি পাওয়া যায়—

'তুমি হবা বট বিরিক্ষ আমি শিষ্য লতা
চরণে জড়ায়ে রব ছাইড়ে যাবা কোথা।'

মনের মানুষের খোঁজ পেলে আর তো ভাবনা নেই। তাঁকে ধরে রাখে ভক্ত ব্রততীর মত বাহু বেষ্টনে। আর কি যাবার পথ আছে? প্রেমের লতার বাঁধন ছিঁড়বে এমন সাধ্য কি তাঁর? তাই তো ভক্ত তার মুর্শীদের খোঁজে রাত্রির স্তব্ধ শান্ত পলগুলিকে কাটিয়ে দিল বিনিদ্র নয়নে। কেঁদে কেঁদে ডাকল একমনে, এক ধ্যানে অন্তরতমকে। গুরুকে তপ করে পেল তারা তৎপুরুষের ঠিকানা। ফকির শানালের জীবনে পাওয়া যায় তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

ঢাকা জেলার নুরুল্লাপুর গ্রামে জন্ম হয় শানালের। বাড়ী ছিল পদ্মা নদীর পারে। সাধারণ মানুষ। লেখাপড়া বলতে কতটুকুই বা জানত। চাষার ছেলে, চাষ-বাস করেই জীবন চালাবার স্বপ্ন দেখাই ছিল তার পক্ষে স্বাভাবিক।

পূর্বের নাম ছিল তার শাহ্‌লাল। গ্রামের লোক ডাকত তাকে শানাল বলে। ঠিক এমনি দিনে আর এক প্রসিদ্ধ ফকিরের আবির্ভাব

হয়েছিল পদ্মার ওপারে। নাম ছিল তার দাশু সিদ্ধাই। শানালের ধর্ম-জীবন সুরু হয়েছিল দাশু সিদ্ধাইর কাছেই। দিনান্তে যখন বনবধূর অবগুণ্ঠনের ফাঁকে ফিকে হয়ে যেত সূর্যের আরক্তিম আভাটুকু পশ্চিমের দিগন্তে—ঠিক তখন শানাল তার ছোট্ট নৌকা ভাসিয়ে দিত পদ্মার খর প্রবাহে। পৌঁছত এসে ঝাউমাহাটি গ্রামে। নিশীথ রাত্রির নীরব স্তব্ধ প্রহরগুলি কাটিয়ে দিত গুরুর শ্রীচরণ প্রান্তে কান্নার সাধনায়। সকাল হোলে ফিরে আসত বাড়ীতে। কিন্তু যে দিন না যেতে পারত ওপারে শানাল, সে দিন নদীর ঘাটে বসে বসে বিরহের কান্নায় ভাসিয়ে দিত দুঃখের লিপিকা। সারিন্দার সুর উঠত সপ্তমে। মনের নিভৃত কোণ থেকে ভেসে আসত ব্যথার বিলাপ—

'ওপারে আমার মুর্শীদের বাড়ী
এপারে বইসে কান্দি আমি রে।'

দূরের প্রেম জীবনকে করে দিত মহিমান্বিত। যুক্ত হয়ে যেত শানাল তার মনের মানুষটির সঙ্গে। চলত মানস-সরোবরে যোগ-যুক্ত আত্মার মিথুন খেলা। বনের কুসুম বন-সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে ছড়িয়ে দিত তার মদির মাধুরী। দেখতে পেত শানাল, তার অন্তরে উদয় হয়েছে চৈতন্যের চন্দ্র! তন্ময় কবি বসত তখন অভিসারিকা সেজে সুন্দরের দর্শন শোভন আকুতি নিয়ে।

কিন্তু কেউ জানত না এ খবর। নৈশাকাশের লক্ষ কোটি তারার মত শানালও ছিল মানুষের চোখে বে-হিসেবের একজন। কিন্তু প্রজ্ঞার প্রদীপ জ্বললে তাকে আঁধার ঢেকে রাখবে কেমন করে। সূর্যের সান্ত্বনা অন্ধকার নয়, আলোর প্লাবন। শানালের জীবনে যে সেই প্লাবন এসেছে। আর সে গোপন থাকবে কি করে?

চৈত্রের আকাশে ফাল্গুনের আগুন। একটুকরো মেঘ নেই। এক ফোঁটা বৃষ্টি নেই। দিন দিন ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছে মাঠ, ঘাট, বন, বাগান।

গাঁয়ের চাষীদের চোখে জল। মুখে সমুৎকণ্ঠা। ভাবনায় দুর্দিনের মেঘ—বুঝি আবার আকাল এলো।

আচার অনুষ্ঠানের বাকী রইল না কিছু। দরগায় মাথা কুটে জানাল কাতর প্রার্থনা। সিন্নী দিল সমারোহ করে। 'নইল্যা' গান গাইল কেঁদে কেঁদে। কৃষাণ মেয়েদের কণ্ঠমুখর হোল 'আড়িয়া মেঘ', 'কালায়া মেঘের' বন্দনায়। কিন্তু তবুও পড়ল না এক বিন্দু বৃষ্টি তৃষাতুরা গ্রাম-সাহারার বুকে।

গ্রামের লোকেরা নিয়ে এলো পদ্মার ওপার থেকে শক্তিমান ফকির শানালের গুরু দাগু সিদ্ধাইকে। কত মন্ত্র উচ্চারণ করল। কতই না কান্না কাঁদল দাগু। সে-কান্নায় সিক্ত হয়ে গেল পাষাণী অহল্যার হৃদয়। কিন্তু তবুও ঝরল না এক বিন্দু বৃষ্টি। অপমানে অসম্মানে মরমে মরতে লাগল দাগু। শ্লেষ-বিদ্রূপে বিদ্ধ হোল তার অন্তর। তার এত দিনের সাধনা ব্যর্থ হয়ে যায় আর কি!

জানতে পারল এ সংবাদ, জানতে পারল শানাল তার ধ্যান-মানসে। যাত্রা করল। চলে এলো পিছু ফেলে দু'ক্রোশ পথ। সুরু হোল তার কান্নার সাধনা। সহসা জমল আকাশে মেঘ। অপলক নয়নে প্রত্যক্ষ করল সবাই। নামল বৃষ্টির মন্দ্রিত ধারা। সিক্ত হোল ধরণী। ছড়িয়ে পড়ল শানালের নাম দিকে দিকে। চলে এলো গুরুকে নিয়ে শানাল মহা আনন্দে।

এমন তো কত ঘটনাই ঘটেছে শানালের জীবনে। বিস্ময়-বিমুগ্ধ হয়ে গেছে কত লোক। রাজনগরের জমিদার বাড়ী। সবার মুখে মাখা বিষাদের কালো-ছায়া। চোখে জল। যেন দুঃখের সমুদ্রটায় জেগেছে ঝড়। কেন? রাজার সখের ঘোড়াটির মৃত্যু হয়েছে। রাজার ঘোড়া! সে কি আর যে সে! কে যেন এমনি দুঃখের দিনে স্মরণ করিয়ে দিল শানালের নামটি। হুকুম দিল রাজা—তাকে নিয়ে এসো। এলো

শানাল। তার স্পর্শে জীবন্ত হয়ে উঠল ঘোড়া। ফিরে এলো মৃত্যুর দুয়ার থেকে জীবনের রাজপথে। সবাই তো অবাক। রাজা গেল বিমুগ্ধ হয়ে। প্রত্যক্ষ করল গেঁয়ো ফকিরের আত্মিক শক্তির অপূর্ব স্ফুরণ। প্রতিষ্ঠা পেল শানালের কান্নার সাধনা দেশে, কালে ও সমাজে।

এমনি ঘটনা আরও ঘটেছে তার জীবনে। আহ্নিক করতে বসেছিল বুদ্ধিমন্ত ঠাকুর নদীর ঘাটে। আহ্নিক শেষে কিছু জলযোগের আয়োজনে বসল গিয়ে একটি বট গাছের নীচে। এমনি সময়ে এলো এক ফকির। বললে তাকে বুদ্ধিমন্ত—'তফাৎ থাক্, ছুঁইস না।'

একটু মৃদু হাসল ফকির। বললে তার পরে—'বাবা, কে মুসলমান, কে হিন্দু? সবাই তো এক আল্লার সৃষ্টি। তুমি যে নদীতে ফুল ভাসাইয়া দিলে, ফুল তো উজান ঠেলিয়া গেল না! দেখ আমি পূজা করি ফুল কোন দিকে যায়।'

ভাসিয়ে দিল প্রমত্তা পদ্মার বুকে একটি ফুল। ফুল এলো ফিরে, ফিরে এলো উজান ঠেলে কূলের দিকে। লুটিয়ে পড়ল বুদ্ধিমন্ত ঠাকুর, লুটিয়ে পড়ল শানালের চরণ প্রান্তে। গ্রহণ করল শিষ্যত্ব। ঠাকুরের অচেতন মনে হোল চেতনার অরুণোদয়। পেল জীবন-জিজ্ঞাসার জবাবটি খুঁজে।

এমনি করেই মানুষের মনোলোক প্রতিষ্ঠা পেল শানাল। হিন্দু, মুসলমান নির্বিশেষে বহু ভক্ত সাধক গ্রহণ করল শানালের শিষ্যত্ব। প্রায় লক্ষাধিক হিন্দু শিষ্য মেনে নিল গ্রাম্য ফকিরকে তাদের অন্তরের 'জন' বলে।

কোন গোঁড়ামী ছিল না ধর্ম সম্বন্ধে শানালের। যেখানে দরদের কান্না, সেখানেই তার ভজনালয়। যেখানে প্রেমের প্লাবন, সেখানেই করত শানাল অবগাহন। মহাভাবের দ্যোতনায় ভাবের ভাবুকের তৃপ্তি পেত যার নাম করে, তাকেই বন্দনা করত অন্তরের প্রেম নিবেদন করে। সে 'ফতেমাই' হোক, আর 'কালী', 'কৃষ্ণই' হোক। জ্ঞানের চোখ

খুলে গেলে আর কি ভেদ-বিচ্ছেদের ভাবনা থাকে? তখন প্রজ্ঞার দীপ জ্বলে ওঠে অন্তরে। সুন্দরের স্নিগ্ধ দিব্য কান্তি আভাসিত হয় দিকে দিকে। মন প্রেমের প্লাবনে ভেসে যায় অসীমের অভিমুখে।

বাংলার নিভৃত পল্লী-মায়ের কোলে এমনি আবির্ভূত হয়েছিল কত না ভাবের ভাবুক। শানালও এই ভাবের উপাসনা করেই পেয়েছিল তার অন্তরতমকে। অনাঘ্রাত বনকুসুমের মত লোক-লোচনের অন্তরালেই রয়ে গিয়েছিল সে। গ্রামের বাউল-কবি ঢাকা, ফরিদপুর ও বরিশালের গ্রামে গ্রামে একদিন যে কান্নার সুর তুলেছিল, আজও সে সুর চাষীদের কণ্ঠে মধুর হয়ে বেজে ওঠে—

'দেইখ্যাছি দেইখ্যাছি
আমার শানাল চান্ বেপারী—
ও তার হাতে আশা বোগলে কোরাণ
গলায় ফুলের মালা রে।'

একশত পাঁচ বছর বেঁচেছিল শানাল। রেখে গিয়েছিল তিন পুত্র। বেচু শা, খোদা জান ও অছিম শা। শানালের মৃত্যুর পরে এরাও ফকির হয়েছিল; দীর্ঘ দিন বেঁচেছিল এরাও। তবে শানালের বয়স কেউ পায়নি।

কত অত্যাচারই না সইতে হয়েছে শানালের শিষ্যদের। মৌলবীরা করেছিল তাদের একঘরে। সমাজ করেছিল বর্জন। শুধু তাই নয়, জটা কেটে দিয়েছে মাথার। কান্নার যন্ত্র সারিন্দাকে ভেঙ্গে ফেলে দিয়েছে দূরে। তবুও পারেনি তাদের মন থেকে মুছে দিতে শানালের নাম। শত অত্যাচার ও দুঃখের দহন তারা সয়েছে নীরবে। বুক-ফাটা কান্নায় কেবল অন্তরতমকে জানিয়েছে মনের বেদনা—

'তোর বাজারে আইস্যা আমার
গেল জাতি কুল রে।'

মান দিয়ে, প্রাণ দিয়ে ভজন করেছে তারা তাদের মুর্শীদ শানালকে। ব্যথিত অন্তর নিরন্তর সন্ধান করেছে সুররাজকে। বলেছে আকুল সুরে ব্যাকুল হয়ে—

'চল যাইরে আমার শানালের তালাসে রে—
মন চল যাইরে।'

জানি না, যে দেশ আমার স্পর্শ থেকে চলে গিয়েছে দূরে, বঞ্চিত করেছে তার শ্যামল-অমল উৎসঙ্গ থেকে, সে দেশের মাঠে, ঘাটে, নদীতে ও অরণ্যে আজও বাজে কিনা সারিন্দা—রাত্রির গভীর বৃন্তে ফুটে ওঠে কিনা ভক্ত সাধকদের পুণ্য জ্যোতিঃ ঘনতনু প্রসূনের মত।

কমলাকান্তের মাতৃ-সাধনা

নিভৃত পল্লীর ছায়া মেদুর বন-পথ। দিগন্ত-বিসারী পল্লী-লক্ষ্মীর মমতা-মধুর স্নেহ। বট-অশ্বত্থের শ্রান্তিহরা ছায়া-শান্তি। রাশি রাশি কুসুম-স্নিগ্ধ উদ্যান। সবুজ ঘাসের মরকত শয্যা। তারই পত্রে পুষ্পে, নদীতে-সৈকতে ছড়িয়ে আছে বাঙলার ভক্ত সাধকের কান্না-করুণ কণ্ঠ। সে সুরে একদিন প্রাণময় হ'য়ে উঠেছিল বাঙলার মরম। ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল গ্রামের।

কত অতীতের সে-কাহিনী। কিন্তু আজও সে-কান্না হরণ করে নেয় হৃদয়কে। ডেকে তোলে নিভৃত বিরলের মনটিকে। ছুটে যাই অতীতের ফেলে আসা পথে। খুলে বসি স্মরণের সিংহ-দ্বার। কান পেতে থাকি অধীর আগ্রহে। মরম ঢেলে শুনি মরমী সাধকের রেখে-যাওয়া সঙ্গীত।

কত কান্নাই না চলে গিয়েছে গ্রামের 'পর দিয়ে। রেখে গেছে সাধক-সন্ত তাদের তপ্ত অশ্রুর অঞ্জলি। জাগিয়ে দিয়েছে তামসী রাত্রিকে। শত শত অবগুণ্ঠিতা বধূর নয়নে ঝরেছে জল। কাতর হয়েছে তারা তাদের আদরিণী উমার বিরহে। প্রবাসী পতির কুশল-কামনায় আকুল হয়ে গিয়েছে বন-কন্যার অন্তর। নীরবে নিভৃতে বসে তারা শুনেছে বিরহী সাধকের কণ্ঠ। সান্ত্বনা পেয়েছে সে-সুরের মিড়-মূর্ছনায়। দূরের প্রেম মধুর হয়ে এসেছে নিকটে। গ্রাম তা ভোলেনি আজও। তার মর্মকোষে প্রাণিত হয়ে রয়েছে 'মালসী', বারোমাসী'

ও 'কেচ্ছা'। সে সুর, সে কান্না এখনো মর্মরিত হয় বনে বনে—ঢেউ তুলে দেয় মাঝি-মাল্লার অন্তরে। মুখর ক'রে তোলে কৃষাণ কৃষাণীর কণ্ঠকে। আর মধুর সমভায় আজও তা বেজে ওঠে, বেজে ওঠে বৈরাগীর একতারায়, ফকিরের সারিন্দায় ও বাউলের কণ্ঠে।

কান্নার সঙ্গীতে ভক্ত ডেকেছে তার আঁধার অন্তরের আলোর দিশারীকে। ব্যাকুল হয়ে বলেছে—

'পশ্চিমে সাজিল ম্যাঘ রে হাওয়ায় দিল ডাক।
আমার ছিঁড়িল হালের পানস নৌকায় খাইল পাক॥
মুর্শীদ রহিলাম তোর আশে!'

এই আশার নদীতে আকুলতার তরী ভাসিয়ে বাউল ভক্ত ডেকেছে তার সুন্দরকে। সেখানে ছোট বড় ভেদ জ্ঞান নেই। নেই তুমিতে আমিতে প্রভেদ। মন একান্ত করে যাকে চায়, তার কি আর না এসে উপায় আছে? বেলাল আজান দিয়ে টলিয়ে দিত আল্লার আসন। রামপ্রসাদ মা, মা বলে ডাক দিয়ে নামিয়ে নিয়ে আসত দেবীকে মন্দির থেকে অঙ্গণে। তার পরে চলত দোঁহে মিলে কত লীলা। উজান পথের পথিক এরা। উজানে নাও ভাসিয়ে বিক্ষুব্ধ তরঙ্গের মধ্যে পড়ে কেঁদে কেঁদে তারা চাইত অন্তরতমের কাছে পারের খোঁজ। ডাকার মতো ডাকলে পাষাণকেও গলতে হবে, এই আত্ম বিশ্বাসে নির্ভর করে প্রেমের সাধক উল্‌টো-পথিক বাউল গেয়েছিল—

'তোমার সুখের চাইতো হাসি
তোমার ফুঁকের চাইতো বাঁশি
আমার অঙ্গে তোমার বিলাস,
তাই ধরতে যে হয় আমারো পায়।'

বাঙলার মৃৎকোষে এমন একটি প্রাণ-শক্তি আছে যার বলে সাধক পেরেছে তার আরাধ্যতমকে যেমন রূপে খুশী তেমনি করে লাভ

করতে। বাউল তার মনের মানুষকে খুঁজেছে গানের ধ্যানে। যায়নি সে রুদ্ধ দেবালয়ের কোণে। তাদের বিশ্বাস 'মনের মানুষ' 'সাঁঈ দরদী' আচার-অনুষ্ঠানের জালে বাঁধা পড়ে নেই। তাঁর সঙ্গে মিলন হবে প্রাণের সরোবরে সহজ-প্রেমে। যিনি অন্তরের তিনি তো বাইরের আচার-বিচারে আট্‌কা পড়ে থাকতে পারেন না! মন যেমন করে তাকে পেয়ে খুশী হবে তিনি তেমন বেশে আসতে বাধ্য। তাইতো দেখি এ দেশে দেব-দেবীর লীলা-বিলাস একান্ত মানবীয় ভাবেই হয়ে গেছে। দেবী কেবল মাতৃরূপেই আসেননি। তিনি কখনো কন্যারূপে, কখনো বা প্রণয়িনীরূপেও ধরা দিয়েছেন সাধকের সাধনায়। এ নজির বাঙলায় একাধিক রয়ে গেছে। দু-একটি এখানে উল্লেখ করছি।

ময়মনসিংহ জেলায় পণ্ডিতবাড়ি গ্রামে দেবীকে দেখতে পেলাম দ্বিজদেবের ঘরে কন্যারূপে। তিনিই আবার এলেন রাঘবানন্দের পার্শ্বে প্রিয়তমা পত্নী হয়ে। দেখালেন নারীলীলা। ধন্য করলেন সাধকের 'তন্‌হা' ক্লিষ্ট অন্তর।

নিমন্ত্রণে অন্ন পরিবেশন করছিলেন বধূ। কাজের ফাঁকে হঠাৎ তাঁর মাথার ঘোমটা গেল খুলে। হলেন গুণ্ঠনহীনা। লজ্জায় আনত হলো বধূর আনন। এখন উপায়? ঘটল এক বিস্ময়কর ঘটনা। আর দুখানা হাত দিয়ে সামলে নিলেন মাথার ঘোমটা। দেখল সে বিস্ময় কেউ কেউ। হলো অবাক। মনে মনে জানাল প্রণাম। বুঝে গেল তারা—মানবীবেশে রাঘবানন্দের পত্নী দেবী। তাইতো 'মিত্তার' ঠাকুরবংশকে বলা হয় 'অর্ধকালী-বংশ'।

প্রেমের সাধনায় উপাস্য-উপাসকের ভেদ এখানে ক্রমেই ঘুচে এসেছে। শাক্তদের আরাধ্যা হলো শক্তি। তারাও সেখানে প্রেমের কান্নায় দ্রবীভূত করেছে পাষাণীর অন্তর। দেবীও থাকতে পারেননি।

এসেছেন নেমে, নেমে এসেছেন ভক্তের কান্নায় সাড়া দিয়ে ছায়া-সঙ্গিনীর মতো।

রামপ্রসাদ বাঁধছেন ঘরের বেড়া। বেত ফিরিয়ে দেবার কেউ নেই কাছে। ভাবলেন কন্যার কথা। ডাকলেন তাকে। কিন্তু কোথায় কন্যা? সে তো কাছে নেই! কেমন ক'রে শুনবে পিতার কণ্ঠ? আবার ডাকলেন—'কই মা, কত আর তোর জন্যে বসে থাকব? তুই কি আর আসবি নে?'

কন্যাবেশে দেবী এসে বাড়িয়ে দিতে লাগলেন বেত। কথাটি বলছেন না। শুধু কাজ করে যাচ্ছেন। রামপ্রসাদ ঘরে বসে বেড়া বাঁধছেন আর ভাবছেন, শরীরে কেন রোমাঞ্চ লাগছে? চোখে কেন আসতে চাইছে জল? একটি দিব্যানুভূতি যেন থেকে থেকে রামপ্রসাদকে দিচ্ছে আকুল করে। হাতের কাজ রেখে নামলেন বাইরে। কি দেখলেন? দেখলেন মুক্তকেশী যাচ্ছেন পালিয়ে। চরণে যেন ঝরছে রক্ত। রামপ্রসাদ অপলক নয়নে রইলেন তাকিয়ে। ছুটে এলেন ঘরে। দেখলেন মেয়েকে।

শুধালেন। জানলেন, সে দেয়নি বাঁধন ফিরিয়ে। চোখে জল এলো রামপ্রসাদের। আকুল হয়ে আর্তকণ্ঠে বললেন. 'তুই দিবি মা মুক্তি, তুই কেন মা সংসার-ঘরের বেড়া বাঁধবি?'

শাক্ত-সাধনার মধ্যে এমন মধুর সম্বন্ধ, এমন স্নেহের আপ্লব আর কোথাও মেলে কি? বাঙলার শাক্ত-সাধক তার উপাস্য দেবীকে পেয়েছে গভীর প্রেমের পথে। সে প্রেম প্রাণের স্নিগ্ধ জ্যোছনায় স্নাত। এক কথায় বলতে গেলে তা একেবারেই মানবীয় প্রেম। বৈষ্ণবদের বিরহের সঙ্গীতগুলির মধ্যে যেমন পাওয়া যায় তাদের একটা স্বকীয় বৈশিষ্ট্য, তেমনি মালসী গানেও শাক্তদের একটা নিজস্ব ধারা অব্যাহতই রয়ে গেছে। বিশেষ করে বাঙলার শাক্ত তার উপাস্য

দেবীর সঙ্গে প্রেমের বাঁধনেই বাঁধা। দক্ষিণ ভারতেও যথেষ্টই শাক্ত-সাধনা রয়েছে। কিন্তু বাঙলার প্রাণধর্মের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ খুঁজতে গেলে মিল মেলে না। বাঙলার 'আগমনী', বাঙলার 'বিজয়া' কন্যাবিরহী পিতামাতার বুক নিঙরিয়ে চোখের কোণে এনে দিয়েছে অজস্র ধারা। যেমন বাউল তার দেবতাকে নানা মানবীয় ভাবে দেখেছে, তেমনি মালসীতেও দেবীকে খুঁজতে দেবালয়ে না গিয়ে হৃদয়ের দুয়ার খুলে বসেছে। এক কথায় বলতে গেলে বলতে হয় যে, বাঙলার স্বকীয় সুর হলো—

'দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।'

একথা তো সত্যিই। সেদিন কি সংঘটিত হয়ে গেল মর্তের স্বর্গ দক্ষিণেশ্বরে? শ্রীরামকৃষ্ণের পত্নী সহধর্মিণী সারদামণি শুধালেন, 'ওগো আমি তোমার কে?'

ঠাকুর বললেন, 'যে মা মন্দিরে—সেই মা-ই নহবতে, সেই মা-ই আমার পদসেবাকারিণী—ওখানেও তুমি, এখানেও তুমি।'

এমনি যেখানের ধারা, সেখানে শাঁখারীর কাছ থেকে শাঁখা পরে মন্দিরের পূজারীর কাছে দামের জন্যে তাকে পাঠিয়ে দেয়ার মধ্যে বিস্ময় থাকলেও অবাক হবার কিছু আছে কি? আবার ভক্তের আহ্বানে শাঁখাপরা হাত তুলে দেবী দেখাতেও কসুর করলেন না। কত সহজ প্রেমের পথে নারায়ণী এসে নারী হয়ে ধরা দিয়েছেন ভক্তের কাছে। বাঙলার মাতৃসাধনার অনন্যতা এইখানেই।

এই সহজ প্রেমের পথিক হয়ে কমলাকান্তও এসেছিলেন বাঙলার কোলে। ব্রহ্মময়ীর আরাধনায় রামপ্রসাদের মতো কমলাকান্তও একান্ত অনুরাগের সঙ্গে গান দিয়ে ভেঙেছিলেন তার মান। লাভ করেছিলেন মায়ের মমতা-মধুর উৎসঙ্গ। একথা তিনি নিশ্চিতই বুঝেছিলেন যে, সাধকের সাধনায় যেরূপ স্পৃহা মূর্ত হয়ে ওঠে, মা ঠিক তেমনটি হয়ে

এসে ধরা দিয়ে ধন্য করেন ভক্তকে। তাইতো কমলাকান্তের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল—

'জাননারে মন পরম কারণ, কালী কেবল মেয়ে নয়।
মেঘের বরণ করিয়ে ধারণ, কখন কখন পুরুষ হয়॥
হয়ে এলোকেশী, করে লয়ে অসি, দনুজ তনয়ে করে সভয়।
কভু ব্রজপুরে আসি, বাজাইয়া বাঁশী ব্রজাঙ্গনার মন হরিয়ে লয়॥'

এ সঙ্গীতের মাঝে যেমন পাওয়া যায় মরমী সাধকের হৃদয়ের পরিচয়, তেমনি আবার সম্প্রদায়গত দ্বন্দ্বের অবসান-ইঙ্গিতটিও প্রচ্ছন্ন রয়েছে। শাক্ত, বৈষ্ণবের মধ্যে যে প্রভেদ, তা যে শুধু বাইরের, অন্তরের নয়, তার কথাও স্পষ্টরূপ পরিগ্রহ করেছে। বাঙলার নিভৃত পল্লীর সরল সহজ গণ-জীবনের 'পর এ গান যে কেবল একটি মুগ্ধ মধুর ভাবই ছড়িয়ে দিয়েছে তা নয়, বাঙালীর আত্মদ্বন্দ্বের মর্মন্তুদ বেদনাময় অধ্যায়টিরও অবসান করেছে। সাধক কবি কমলাকান্ত একথাটি সেদিন স্পষ্ট ক'রেই বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, আরাধ্য বস্তু অন্তরের, বাইরের নয়। বহিরঙ্গ মনকে অন্তরঙ্গ না করতে পারলে তর্কে বা তত্ত্বে তাঁকে পাওয়াও সম্ভব নয়। সকলেই সেদিন এ সত্যটি উপলব্ধি করতে পেরেছিল যে—

'যে রূপে যে জনা করয়ে ভাবনা,
সে রূপে তার পুরয়ে কামনা;
দ্বৈত ভাব ত্যজ, নিত্যানন্দে মজ,
অনিত্য ভাবনায় কি আর ফল।'

তত্ত্বের নিগূঢ়তা নেই। পাণ্ডিত্যের আভিজাত্য নেই। নেই এতে জ্ঞানের গরিমা। এ যেন বাঙলার জল বায়ুর মতই সহজ, সরল ও সুন্দর। অথচ এ না হলে তো চলে না। বাউল ও শাক্তে এখানে এক অপূর্ব মিলন সাধিত হয়েছে।

এদেশের বাউল একদিন গেয়েছিল, তত্ত্বজ্ঞদের কটাক্ষ করে—

'তন্ত্রে মন্ত্রে পাতলি যে ফাঁদ
দেবে সে কি ধরা
উপায় দিয়ে কে পায় তারে
শুধু আপন ফাঁদে মরা।'

ভাবাকাশের অরুণোদয়ের সূর্যটির মত কমলাকান্তের আবির্ভাব হয়েছিল শ্যামল বাঙলার কোমল কোলে। এসেছিলেন তিনি ১১৭৫ বঙ্গাব্দে বর্ধমানের অম্বিকা গ্রামে। শৈশবের খেলা ঘরে এক রকম দৈন্য দুঃখকেই সঙ্গী করে বেড়েছিলেন তিনি। রামপ্রসাদের গান ছিল তাঁর আশৈশবের সাথি। বেদনার সিন্ধু মন্থন করে তুলেছিলেন তিনি আনন্দের অমৃত। মনের দীপ জ্বেলে অনন্ত দুঃখের অন্ধকারকে অপসৃত করবার একটি সযত্ন প্রয়াস পেতে তিনি একটুও কুণ্ঠিত হননি। ক্রমে বয়স বাড়লে তাঁর পিতা মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের মৃত্যু হলো। চলে গেলেন তিনি দুই ছেলে ও পত্নী মহামায়াদেবীকে অভাবের ঘরে ফেলে। মহা আর্থিক সঙ্কটের মুখোমুখী এসে দাঁড়ালেন মহামায়া, দাঁড়ালেন কমলাকান্ত ও শ্যামাকান্তের হাত ধরে। চতুর্দিকে যেন দেখতে লাগলেন অন্ধকার। কি হবে উপায়? কেমন করে তিনি দুটি অন্ন খুঁটে বাঁচিয়ে রাখবেন ছেলেদের? অবশেষে চলে এলেন পিত্রালয়ে। মাতামহ শ্রীনারায়ণ ভট্টাচার্যের স্নেহে ও আদরে লালিত-পালিত হতে লাগলেন তাঁরা। কমলাকান্তের মাতুল করে দিলেন কিছু ভূ-সম্পত্তি। জীবনে বাঁচার পথটি একটু সরল হয়ে এলো।

বয়স বেড়ে চলল। এখন তো বিদ্যাশিক্ষা না করলে নয়, চলে এলেন কমলাকান্ত অম্বিকায়। এলেন এক যজমান গৃহে। কিন্তু মন যে বসতে চায় না পুঁথির পাতায়। কি যেন এক অব্যক্ত অভাব তাঁকে নিয়ত পীড়ন করতে লাগল। কেঁদে কেঁদে গান গেয়ে সে অশান্তির

উৎসে আনলেন শান্তির স্নিগ্ধ পেলবতা। একটু ঝুঁকে পড়লেন লেখা-পড়ার দিকে। মেধা ছিল। ছিল তার অদ্ভুত স্মরণ-শক্তি। অল্প দিনের মধ্যেই তাই প্রিয় হয়ে উঠলেন অধ্যাপকদের। করলেন তাঁদের খুশী।

রামপ্রসাদকে কেন্দ্র করেই সুরু হলো তাঁর জীবনের সাধনার অধ্যায়। বিশালাক্ষীর মন্দিরে বসে গাইতেন গান। করতেন ধ্যান। খুঁজতেন জীবনের রাজপথ—যে পথে নেই দৈন্য, দুঃখ, অভাব ও হাহাকার। ঠিক এমনি একটি সুখ-নিকেতনের খোঁজে তন্ময় হয়ে যেতেন কমলাকান্ত। চোখ বুজে আত্মলীন হয়ে আত্মশক্তির স্ফুরণ প্রত্যক্ষ করবার জন্যে কাটিয়ে দিতেন দিনান্তের অন্ধকারটুকুও। কেউ তা জানত না। বুঝত না। কিন্তু যারা একেবারে কাছের লোক তারা কমলাকান্তের এই বিরাগ দেখে একটু শঙ্কিত হয়েই পড়লেন। মায়ের মনও উঠল কেঁদে। ছেলেকে গৃহী করবার মানসে মাতুল দিলেন তাঁর উপনয়ন। মা খুঁজতে লাগলেন ভালো একটি কনে।

এমনি দিনে গোবিন্দ মঠের প্রভুপাদ চন্দ্রশেখর স্বামীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল কমলাকান্তের। তিনি মনের খুশীতে দীক্ষা দিলেন তাঁকে। চলল নীরবে নিভৃতে বসে সাধন-ভজন। উর্বর জমিতে বীজ পড়লে যা হয়। কমলাকান্ত আরো গভীরে ডুব দিলেন। মন চলে অন্তর্দেশের অভিসারে। কি করে আর আটক থাকবেন তিনি ঘরে? 'ঘর কইনু বাহির, বাহির কইনু ঘর' এই ভাব যেন তাঁকে বসল পেয়ে। মায়ের প্রাণ গেল আরো ব্যাকুল হয়ে। ভাবলেন তিনি, তাঁর বুকের ধন যায় বুঝি হারিয়ে। কি করে রাখবেন তাকে ঘরে? বিয়ে দিলেন ছেলের। ভাগ্যের বিড়ম্বনা, রইল না সে বৌ। বালিকা-বধূ একালের খেলা সাঙ্গ করে চলে গেল পরপারে। কিন্তু মা কি ছাড়েন? শোকের অনল বুকে নিয়ে আবারও বিয়ে দিলেন তার ছেলেকে।

সংসার যার কাছে আশ্রম তুল্য, নারী যে তাঁর কাছে নারায়ণীর মতই আসেন। বিয়ে করেও কমলাকান্ত গৃহী হ'তে পারলেন না। গৃহকর্মের বিরতি নেই, কিন্তু রতির 'পাঁজালে' বিরতির ধূপ জ্বালিয়ে শ্যামা মায়ের চরণ তলে আত্ম-সমর্পণ করবার বাসনাকেও তাই বলে বাদ দেননি। এম্‌নি দিনে একদা তিনি বর্ধমানের গুজ্ঝড়ে গ্রামে গেলেন রক্ষাকালীর পূজো দেখতে। দেখা হলো সেখানে তান্ত্রিক কেনারাম চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে। আলাপ হলো। তৃপ্ত হলেন কমলাকান্ত। চাইলেন তাঁকে গুরুপদে বরণ করতে। বললেন তাঁর কাছে অশান্ত অন্তরের নির্মম দহনের কথা খুলে। কেনারাম সব বুঝলেন। ভক্তির দুয়ার খুলে গেলে ভক্তের অন্তর নিয়ত নিয়ন্তার ঘর খুঁজেই চলে। বাহ্যজ্ঞান, জাগতিক প্রবাহের উজানে তখন ভাসিয়ে দেয় তার নিবৃত্তির তরী। এমন উন্মাদনা তখন হয় বৈকি। কমলাকান্তেরও তাই হয়েছে।

তন্ত্রসাধক কেনারাম কমলাকান্তকে দীক্ষা দিলেন। উন্মুক্ত করে দিলেন সিদ্ধিদ্বার। উদ্‌ভাসিত হলো তন্ত্রের রহস্য। তিনি যুক্তি-বিচার দিয়ে বুঝলেন, সংসারে থেকেও তাঁকে পাওয়া যায়। প্রেয়সীর বিলাস-নিভ শয্যায়ও বিশ্ব এসে ধরা দেয়, যদি থাকে সাধনা। তাই তিনি গৃহত্যাগ না করে ঘরকেই আশ্রম জ্ঞানে গ্রহণ করলেন। সুরু হলো তাঁর জীবনের জয়যাত্রা। নির্জন নিস্তব্ধ বন-ভূমির গভীরে গিয়ে বসেন তিনি পঞ্চমুণ্ডির আসনে। নয়ন মুদে খুলে বসেন ধ্যাননেত্র। ব্যাকুল হ'য়ে খুঁজতে লাগলেন তাঁর অন্তরেশ্বরীকে। ক্রমে এলো তাঁর জীবনের পরম লগ্ন। ইষ্টনাম জপতে জপতে দেখলেন আলোর বিচ্ছুরণ। কে যেন জ্বেলে দিল হৃদয়ের গভীর অন্ধকারে দিব্য জ্যোতির অমৃত-প্রদীপ। তন্ময় হলেন কবি। নয়ন মেলেও দেখলেন তাই। সেই ঘনীভূত আলোর মাঝ থেকে আভাসিত হলেন কমলাকান্তের চির-আকাঙ্ক্ষিত দেবীমূর্তি। কিন্তু স্থায়ী হলো না তা। ভাবের ভাবুক যখনই নেমে

আসেন সহজে, অমনি সে দিব্য-মূর্তি চলে যায় দর্শনের অন্তরালে। বড়ই অধীর হলেন কমলাকান্ত। ভাবলেন, এ মাটির বিশ্বে তাঁকে তো দেখতে পাইনে। তবে কি ষড়রিপুর দাস হয়েই রইতে হবে মা? প্রসন্না হলেন দেবী। কমলাকান্তও যেন নিবিড় নিশীথিনীর মত বাইরের বিশ্ব থেকে ছুটি নিয়ে অন্তরের দুয়ারেই বসে থাকতে ভালোবাসেন। একদিন হলো এক কাণ্ড—স্নান করতে গেলেন বিশালাক্ষীর পুকুরে। হলো সেখানে সমাধি। লুপ্ত হয়ে গেল বাহ্যজ্ঞান। ভাসতে লাগল দেহখানা পুকুরের জলে। লোকেরা তো দেখে অবাক্। ভাবল সবাই, নিশ্চয়ই জলে ডুবা মৃতদেহ। ধরাধরি করে তুলল তাঁকে। রাখল মাটিতে শুইয়ে। কিন্তু কিছু পরেই বুঝল তারা, বুঝল এ দেহে প্রাণ আছে। অবাক্ বিস্ময়ে সকলে রইল স্তব্ধ হয়ে। প্রত্যক্ষ করল তারা সাধক কবির ভাব-সমাধি। নত করল মাথা। দিকে দিকে ধ্বনি উঠল—

'জগৎ জুড়ে নাম রটিল
কমলাকান্ত কালীর বেটা।'

বিশালাক্ষীর মন্দিরেই সিদ্ধিলাভ করলেন কমলাকান্ত। গান গেয়ে লাভ করলেন তাঁর ইষ্টদেবীকে। শিমূল তলায় বসে বসে কমলাকান্ত অঝোর ধারায় কাঁদতেন আর গাইতেন গান। দেবী পারতেন না থাকতে। নেমে আসতেন ঐ গ্রামের কোন এক নারী-রূপ পরিগ্রহ করে। নীরবে বসে বসে শুনতেন গান। কথা বলতেন দুইজনে।

এমন অলৌকিক ঘটনা তো কতই ঘটেছিল তাঁর জীবনে। একদিন কমলাকান্ত চাইলেন মাগুর মাছ দিয়ে ভোগ দিতে দেবীকে। কিন্তু কোথায় পাবেন তা? মন বড় ভেঙ্গে গেল। ব্যাকুল হয়ে ডাকতে লাগলেন মাকে। মা এলেন ভক্তের ডাকে সাড়া দিয়ে। নিয়ে এলেন মাগুর মাছও। কিন্তু অন্যবেশে। বাগদী নারীর রূপ ধরে। দুজনে

আলাপ হলো। বাগ্‌দী নারী বেশে দেবী তৃপ্ত হলেন ভক্তের ভাব-মধুর সঙ্গীত শুনে।

কিছুদিন গেলে কমলাকান্তের দেখা দিল আর্থিক সঙ্কট। দৈন্যের হাহাকারে অভাবের পীড়নে কবি একটু বেসামল হয়ে পড়েছিলেন। এমন দিনে তাঁর এক শিষ্য গুরুর অভাব দেখে ব্যথা পেল। তাঁর সংসারের সকল ভার গ্রহণ করে নিয়ে এলো চান্না থেকে অম্বিকায়। এখানে এসে কমলাকান্ত হারালেন তাঁর মাকে। মনটা বড় ভেঙ্গে পড়ল। থেকে থেকে কেবল স্নেহশীলা জননীর কথাই তাঁর মনে আসতে লাগল। তিনি ফিরে এলেন চান্নায়। ওড়গ্রামের ডাঙ্গায় প্রতিষ্ঠা করলেন একটি আশ্রম। ছিল এখানে একটি চতুষ্পাঠীও। কিন্তু বড় ডাকাতের ভয় ছিল। পথে পান্থজন পেলে আর কি কথা ছিল? সর্বস্ব লুণ্ঠন করে তাকে মেরে লাস গুম করে তবে শান্তি। কমলাকান্ত একদিন পড়লেন তাদের হাতে। দস্যুগণ তো মহা-উল্লাসে ছুটে এলো তাঁর প্রাণনাশ করতে। নিরুপায়, নিরাশ্রয় কবি মন ঢেলে গান ধরলেন—

'আর কিছু নাই মা শ্যামা মা
তোমার কেবল দুইটি চরণ রাঙ্গা।
শুনি তাও নিয়েছেন ত্রিপুরারি,
দেখে হলাম সাহস ভাঙ্গা।'

গান শুনে ভক্তের আরাধ্যাতম দেবী এলেন নেমে। দাঁড়ালেন ডাকাতদের সম্মুখে খড়্গা নিয়ে হাতে। দস্যুদের অন্তরে এলো ভাবের প্লাবন। তারা কেঁদে কেঁদে চাইল কমলাকান্তের পাদপদ্মে ক্ষমা। ধন্য হলো চর্মচোখে মাতৃরূপ দর্শন করে। নিবৃত্ত হলো দস্যু-বৃত্তি থেকে।

এমন কত ঘটনাই না ঘটে গেছে তাঁর জীবনে। বর্ধমানের মহারাজা তেজশ্চন্দ্র কমলাকান্তের গানে ও পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে দীক্ষা

নিলেন তাঁর কাছে। বরণ করলেন তাঁকে গুরুপদে। কেবল তাই নয়, তেজশ্চন্দ্র তাঁর রাজসভায় প্রধান পণ্ডিতের আসনে প্রতিষ্ঠিত করলেন কমলাকান্তকে। নির্মাণ করে দিলেন কোটানহাটে একটি বাড়ী। রাজকুমারও গ্রহণ করলেন তাঁর শিষ্যত্ব। কোটানহাটেও কমলাকান্তের একটি কালীবাড়ী প্রতিষ্ঠিত হলো। কমলাকান্ত এখানেই হারালেন তাঁর স্ত্রীকে। রইল একটি মাত্র কন্যা-সন্তান। ব্যথার সমুদ্র-মন্থনে উঠল অমৃত। স্ত্রীর দাহ-কৃত্য শেষ করে কমলাকান্ত নৃত্য করতে করতে গেয়েছিলেন—

'কালী সব ঘুচালি লেঠা
শ্রীনাথের লিখন আছে যেমন,
রাখবি কি না রাখবি সেটা ॥'

তেজশ্চন্দ্র একদিন গুরুর নিকটে প্রশ্ন করেছিলেন—আপনি কি অমাবস্যার রাত্রে চাঁদ দেখতে পান ?

তখনকার মত কমলাকান্ত নীরব রইলেন। এলো অমাবস্যার ঘন রাত্রি। ডাকলেন গুরু শিষ্যকে। বললেন তাকিয়ে দেখতে অমাবস্যার নিশীথ-নভে পূর্ণচন্দ্রের প্রসন্ন প্রকাশ। দেখলেন তেজশ্চন্দ্র, দেখলেন অমা-রাত্রির অন্ধকারে আলোকের বিপুল প্লাবন। মুগ্ধ-বিস্ময়ে মূক হয়ে গেলেন রাজা। অপলক নেত্রে দেখতে লাগলেন গুরুর অলৌকিক শক্তির বিকাশ।

দিন ফুরিয়ে এলো। এবারে বিদায়ের পালা। রাজা জিজ্ঞেস করলেন তাঁকে সজ্ঞানে পুণ্যতোয়া গঙ্গার তীরে নিয়ে যাবেন কি না। উত্তরে বললেন কমলাকান্ত—

'কি গরজে গঙ্গা তীরে যাব ;
আমি কালীমায়ের ছেলে হয়ে—
বিমাতার কি শরণ লব।'

পঞ্চাশ বছর বেঁচে ছিলেন সাধক-কবি। দেখিয়ে গেলেন কত না বিচিত্র-লীলা। মানুষের সংসারেও যে দেবী এসে অধিষ্ঠিতা হয়ে জীবের জীবনে মধুর মমতায় বিকাশ লাভ করে থাকেন, তার একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ কমলাকান্তের দুশো উনসত্তরটি মাতৃ-আরাধনার সঙ্গীতের মাঝ দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। 'মায়া-মোহ' সমুদ্রের পারে দাঁড়িয়ে কবি তাঁর অন্তরের দীপ জেলে দয়াময়ীকে পেয়েছিলেন।

উপনিষদের যুগ থেকে ভারতীয় সাধনার বিচিত্র গতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে প্রকাশ লাভ করে আসছে। কেউ সহজ প্রেমের পথে উজানে ভাসিয়ে দিয়েছে তরী। কেউ বা তত্ত্বের নিথরে দিয়েছে ডুব। কত মত, কত পথ তৈরি হয়ে গেল। কিন্তু সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই 'উল্‌টো' পথটি প্রচ্ছন্ন রয়ে সাধকের সাধনাকে মধুর করে তুলেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ জীবন-দর্শনের একদিক

জনাকীর্ণ পৃথিবী।

দেশে দেশে, নগরে নগরে কত লোকের আনাগোনা।

বিচিত্র তাদের কর্ম-ধারা। চলেছে খরস্রোতা নদীর মত নানা পথে, নানা হাটে। কিন্তু মানুষ তার কতটুকু খবর রাখে? কতটুকু বা জানে?

বিশ্ব-বিধাতার সৃজিত কর্মকেন্দ্রে আমরা এক-একটি কর্মী।

কার কর্মী? কে আমাদের মালেক?

এক কথায় এর জবাব হলো—স্রষ্টা।

জীবনের অনন্ত প্রকাশের অসীম দিগন্তের পানে তাকালে মানুষ নিজেই বুঝতে পারে না নিজেকে। কিন্তু কাজ সে করে যাচ্ছে। গান সে গাইছে। দুঃখের দুয়ারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চোখের জলও ফেলছে। এই যে দুঃখ সুখের পারাবার—একে আবিষ্কার করবার নামই হলো ঈশ্বর-সন্ধান। সূর্য ওঠে আকাশে। জ্যোছনার রজত-স্নেহের পরশ দেয় চন্দ্র। ঢেউ জাগে নদীতে। মর্মরিত হয় বনানী। বায়ু বয়। জাগে ঘন নিঃস্বন। একটু ব্যতিক্রম নেই নিত্যিকারের নিয়মের। সব যেন ছিমছাম। ছন্দবদ্ধ।

প্রকৃতির এই লীলা খেলার সঙ্গে মানুষের অন্তর জগতের একটা নিখুঁত মিল রয়েছে। সেখানেও জমে দুঃখের মেঘ। মর্মরি ওঠে

আনন্দের। সুখের প্রবাহ চলে। দুই জগতের দুই ধারা। এই ধারার উৎস মূলটি খুঁজে বের করবার নামই হলো ঈশ্বর আরাধনা।

আমরা যারা শিক্ষিত বলে গর্বিত—তারা বাদ দিয়েছি জীবন থেকে ধর্মকে। ঈশ্বরের নাম শুনলে করি ব্যঙ্গ। মুচ্‌কি হাসি। বাঁকা চোখে তাকাই।

কিন্তু সত্যিই কি ঈশ্বর নেই?

এ জটিল প্রশ্নের জবাবও জটিল। তবুও বলব তিনি আছেন।

প্রমাণ কি?

এ প্রশ্ন অবশ্য অনেকেই করে বসবে। স্বাভাবিক।

এর প্রমাণ দেওয়া যায় না বলে। অনুভূতির অমৃত-প্রস্রবণে অবগাহন কর। খুলে দাও হৃদ্‌-বৃন্দাবনের দুয়ার। ডুবে যাও মনের অতল-গহনে। তবে প্রমাণ পাবে। দেখবে দীনতার দুয়ার ভেঙে এসেছে আলোর দিব্য-কান্তিত। ভ্রান্তির ভবন থেকে মন মধুময় হয়ে গিয়েছে। সুন্দরের অক্লিষ্টকান্তির কিরণ সম্পাতে সমস্ত অন্ধকার গিয়েছে অপসৃত হয়ে। তখন যা বাক্য তাই ব্রহ্ম। যা সঙ্গীত তাই মন্ত্র। যুক্ত জগতের সব কাজ থেকে তখন মুক্তির মহানন্দ। কিন্তু এই আত্মমুক্তিই শেষ কথা নয়। বলেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ—'জীব চার প্রকার—'

কি কি?

'বদ্ধ জীব, মুমুক্ষু জীব, মুক্ত জীব ও নিত্য জীব। বদ্ধ জীব বিষয়ে আসক্ত হয়ে থাকে, আর ভগবানকে ভুলে থাকে—ভুলেও তাঁর চিন্তা করে না। মুমুক্ষু জীব—যারা মুক্ত হবার ইচ্ছা করে। কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ মুক্ত হতে পারে, কেউ বা পারে না। মুক্ত জীব—যারা সংসারে কামিনী-কাঞ্চনে আবদ্ধ নয়, যেমন সাধু মহাত্মারা; যাদের মনে বিষয়-বুদ্ধি নাই, আর যারা সর্বদা হরি-পাদপদ্ম চিন্তা করে।

নিত্য জীব - যেমন নারদাদি; এরা সংসারে থাকে জীবের মঙ্গলের জন্য—জীবদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য'।

মানুষের কাম্য হবে মানুষের কল্যাণ ব্রতে জীবন-উৎসর্গ করা। মানুষের সেবার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের দর্শন পাওয়া। তবেই জীবন সার্থক। জন্ম সত্য।

হৃদয়ের বাসর ঘরে মুঠা মুঠা ছড়িয়ে দাও প্রসূন। বিস্মরণের মঞ্জুষা ভরে যাক চেতনার সুধা-ধারায়। আনন্দের আপ্লবে মনের সব আবিল অপসৃত হোক। তবেই তিনি সেই পবিত্র মন্দিরে ঠাঁই নেবেন।

যত কিছু চাওয়া ও পাওয়ার—তা যেন কান্নার অশ্রু হয়ে লুটিয়ে পড়ে প্রেমময়ের চরণপদ্মে। দিয়ে তৃপ্ত হও। নেয়ার বাসনায় বিভ্রান্ত হয়ে যেও না। তবেই সেবার শক্তি অন্তরে জাগ্রত হবে; প্রেম ও প্রাণ। এ দুটো হলেই তাকে পাওয়া যায়। বিচারের দরবারে পাণ্ডিত্যের তর্ক যারা করবার তারা শুষ্ক তর্ক নিয়েই থাক। তত্ত্বের নিথরে ডুব দিয়ে তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির আসন অলংকৃত করুক! যার অন্তর সত্য সন্ধানে পাগল হয়ে গিয়েছে—যে কেঁদে কেঁদে তাকে ডাকবার অধিকার অর্জন করেছে—আসুক সে। বসুক মনের মন্দিরে সুন্দরের দর্শন-মনন নিয়ে। গান ধরুক মনের আকুতি নিবেদন করে। যখন তিনি আসবেন—হাসবেন। বাড়িয়ে দেবেন বাহু—তখন অন্তরই বলে উঠবে—

'এবার নীরব করে দাও হে তোমার
মুখর কবি রে।'

প্রেমের জোয়ারে সব অহংকার ভেসে যাবে। মৃত্যু থেকে অমৃতের সন্ধানে মন মধুর হয়ে যাবে।

বলেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ, শাস্ত্র-বিচার কতদিন দরকার জান? যতদিন না সচ্চিদানন্দ সাক্ষাৎকার হন। যেমন ভ্রমর যতক্ষণ না ফুলে বসে,

ততক্ষণ গুন্ গুন্ করতে থাকে, আর যখন ফুলের উপরে বসে মধুপান করতে থাকে, তখন একেবারে চুপ—'

কেশব সেন এসেছেন দক্ষিণেশ্বরে—

এসেছেন ঠাকুরের কাছে। জিজ্ঞেস করলেন, 'অনেক পণ্ডিত লোক বিস্তর শাস্ত্রাদি পাঠ করেন, কিন্তু তাঁদের জ্ঞানলাভ হয় না কেন?'

উত্তরে বললেন ঠাকুর, 'যেমন চিল, শকুন অনেক উঁচুতে ওড়ে, কিন্তু তাদের দৃষ্টি থাকে' গো-ভাগাড়ে, তেমনি অনেক শাস্ত্র পাঠ করলে কি হবে?

তাদের মন সর্বদা কাম-কাঞ্চনে আসক্ত থাকার দরুণ জ্ঞানলাভ করতে পারে না।'

* * * *

'গ্রন্থ নয়, গ্রন্থি—গাঁট। বিবেক-বৈরাগ্যের সহিত বই না পড়লে পুস্তক পাঠে দাম্ভিকতা, অহংকারের গাট বেড়ে যায় মাত্র।'

বলেছিলেন ঠাকুর এক তার্কিককে, 'যদি এক কথায় বুঝতে পার ত' আমার কাছে এস, আর খুব তর্ক-যুক্তি ক'রে যদি বুঝতে চাও ত কেশবের কাছে যাও।'

জ্ঞানের উদ্দীপন হলে অহংকারের দুর্বহভার থাকে না। তখন সে শুদ্ধ শান্ত সুন্দর। আর যদি তা না হয়—তবেই যত গোল। আত্মপ্রচারের মোহে ক্লিষ্টপ্রাণ তর্কের তুফানে ভাসিয়ে নিতে চায়। নিজেকে জাহির করবার বিলোল বাসনায় চঞ্চল হয়ে ওঠে।

এ সম্বন্ধে ঠাকুরই বলেছেন যথার্থ কথা, 'যেমন খালি গাড়ুতে জল ভরতে গেলে ভক্ ভক্ করে' শব্দ হয় কিন্তু ভরে গেলে আর শব্দ হয় না, তেমনি যার ভগবান লাভ হয়নি সেই-ই ভগবান সম্বন্ধে নানা গোল করে, আর যে তাঁর দর্শনলাভ করেছে সে স্থির হয়ে ঈশ্বরানন্দ উপভোগ করে।'

যতক্ষণ না পাওয়ার বেদনা ততক্ষণই কান্না। তর্ক। যুক্তি। কিন্তু তিনি এলে সব শান্ত হয়ে যায়। হৃদয়ের রিক্ত জমিন পূর্ণ হয়ে ওঠে।

মানুষ সংসারে বাস করেও ঈশ্বরলাভ করতে পারে।

কেমন করে?

অনুরাগের সড়ক পেড়িয়ে যেতে হয়। কান্নার নদীতে জাগিয়ে দিতে হয় প্লাবন। তবে তিনি না এসে পারেন এমন সাধ্য কি?

নিত্য জীবের মত মনটা ফেলে রাখতে হবে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে। কিন্তু আত্মোৎসর্গ করতে হবে জীব-কল্যাণে। ধ্যান, জপ, তপ, সাধন-মনন, আরাধন এ দিয়েও যেমন তাঁকে পাওয়া যায়—আবার গান, কান্না, আর্তি এ দিয়েও তাঁকে নিয়ে আসা যায়।

মন কাঁদলে তাকে যে আসতেই হবে। গুহায় বসে যিনি সাধন করেন তিনিও সাধক। আর সংসারে শত লক্ষ কর্ম কোলাহলের মধ্যে দাঁড়িয়ে যিনি ঈশ্বর আরাধনায় মগ্ন হন তিনিও সাধক।

'গৃহে থেকে গৃহ কর্ম
যত কিছু কর
আসলে আসন যেন
দৃঢ় করে ধর।

এই আসলের আসনটি ধরতে হবে। যোগ যুক্ত হতে হবে তাঁর সঙ্গে। তার পরে সংসারে থাকো। কোন ক্ষতি নেই। ঠাকুর তো সংসার ছেড়ে বনবাসী হতে বলেন নি কাউকে। ঘরে থাকো। সব কর্ম করো। কিন্তু মনটি যেন স্মরণ রাখে মালেককে। বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে বলেছিলেন ঠাকুর—'এতদিন খাল, ডোবা, পুকুর দেখেছি। আজ সমুদ্র দেখলাম।'

উত্তরে বললেন বিদ্যাসাগর, 'তাহলে নোনা জল খানিকটা নিয়ে যান।'

বললেন ঠাকুর, 'না গো, নোনা জল কেন? তুমি ত অবিদ্যার সাগর নও, তুমি যে বিদ্যার সাগর।...তোমার কর্ম সাত্ত্বিক কর্ম। তুমি বিদ্যাদান, অন্নদান করছ, এও ভাল। নিষ্কাম হয়ে করতে পারলেই এতে ভগবান লাভ হয়। কেউ করে নামের জন্য, পুণ্যের জন্যে। তাদের কর্ম নিষ্কাম হয় না। তুমি যে সব কর্ম করছ এ সব সৎকর্ম। যদি আমি কর্তা এই অহংকার ত্যাগ করে কাজ করতে পার তাহলে খুব ভাল। জগতের উপকার মানুষ করে না। যিনি চন্দ্র-সূর্য সৃষ্টি করেছেন, যিনি মা-বাপের মনে স্নেহ, মহতের মনে দয়া, সাধুর মনে ভক্তি দিয়েছেন—তিনিই করেন। সবই রামের কাজ। রামের ইচ্ছা।'

বিশ্ব-প্রবাহের বিচিত্র ধারার সঙ্গে পরিচিত হতে হবে। জগতের যা-কিছু সুন্দর যা কিছু রমণীয় শুধু তাই গ্রহণ করে কুৎসিতের দিকে অবহেলায় না তাকালে চলবে না। তাকেও দেখতে হবে। দিতে হবে কোল। আনতে হবে প্রদোষ থেকে প্রত্যুষে। মৃত্যু থেকে অমৃতে। তবেই সেবার স্বার্থকতা লাভে সক্ষম হবে।

আজ হানাদারী পৃথিবীর দিকে তাকালে ভয় জাগে মনে। চতুর্দিকে চিৎকার করে সবাই বলছে, বিশ্বশান্তি চাই। বিশ্বভ্রাতৃত্ব চাই। চাই ঐক্যের মহা মিলন-তীর্থ। কিন্তু এ বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা কেমন করে সম্ভব? এক মুখে শান্তি ব'লে চিৎকার করে পেছনে হাইড্রোজেন বোমার পরীক্ষা চললে কি করে বিশ্বমন আশ্বস্ত হয়? কি করে তারা বিঘ্নহীন হয়ে রাত্রির বাসরে শান্তির শয্যা রচনা করে? মন মুখ দুই করে তো মহৎ কাজ হয় না। রাজনীতির কাঠিন্যে শান্তির ফরমাস জারি করলেই শান্তির সঞ্চার হয় না। শান্তি হলো মনে। মনের জমিন আবাদ করলে সেখানে শান্তির স্নিগ্ধ পূষণ চোখ মেলে তাকাবে।

তা কেমন করে সম্ভব ?

চাই আত্ম-শুদ্ধি। আত্ম-জাগরণ। আত্মাহুতি।

এই তিন গুণে গুণী হয়ে তার পরে নিখিল বিশ্বের শান্তি-তীর্থ রচনা করা চলে।

হিংসায় কপোট পৃথিবী। দিকে দিকে মৃত্যুপথযাত্রির আত্মদীর্ঘ-চিৎকার। সুখ নাই। শান্তি নাই। আছে শুধু মিথ্যা, ছল, চাতুরী। মানুষকে মানুষ সংহার করছে ছলে-বলে-কৌশলে। স্বার্থসিদ্ধির অজস্র কুটিল পথে পদসঞ্চার করে নিশীথ-রাত্রির নীরব নির্জনে চলেছে বিশ্ব-প্রাণকে বিধ্বস্ত করবার আয়োজন। কোথায় পথ। কোথায় যুগ-তন্দ্রার চেতনা! কোথায় সত্য শিব সুন্দরের আরাধনা! রাস্ট্রগোষ্ঠীর নায়কগণ শুধু ধ্বংসের দীক্ষায় নিজেদের উদ্বুদ্ধ করছে।

যারা সে অন্ধকার আবর্তে দাঁড়িয়ে সত্যিকারের বাঁচবার মন্ত্র উচ্চারণ করছে তারাও যেন পেরে উঠছেন না কুচক্রীদের সঙ্গে। এমন বিশৃংখল পরিবেশে শান্তির সনদ কে রচনা করবে? কে দেবে আশা, কে দেবে মূক ম্লান মুখে মুখে ভাষা! কে শোনাবে জীবনের জয়-গান! সংসারে যারা আর্ত পীড়িত দুঃখী, যারা হাহাকারে হতাশায় দিন কাটিয়ে দেয়, তাদের অন্নরিক্ত ক্ষুধাক্লিন্ন মুখে দুটি অন্ন খুঁটে না দিতে পারলে ধর্ম মিথ্যা। আদর্শ ভ্রান্ত।

এই মানুষের বাঁচার ধর্ম, মানুষের আত্ম জাগৃতির মন্ত্র উচ্চারণ করেছেন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ উদাত্তকণ্ঠে। এবং তারই মহতী প্রকাশ ঘটেছে স্বামী বিবেকানন্দের জীবনে।

আমরা দেখতে পাই—ঊনবিংশ শতাব্দীর বুকে দাঁড়িয়ে যখন এক সঙ্গে ব্রহ্মধর্ম, খ্রীস্টানধর্ম ও গোঁড়া হিন্দুধর্ম ত্রিধা অভিযান চালিয়ে বিভ্রান্ত করে ফেলছিল জনচিত্ত—তখন একমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণ এমন একটি মহীরুহের মত দাঁড়ালেন যেখানে এসে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীস্টান ও মুসলমান

সকলেই তাদের প্রাণের প্রশান্তি খুঁজে পেল। দেখল নতুন আলো। নব প্রাণ নব গানে মুখর হলো আকাশ-বাতাস। মানুষের দহনের শান্তি হলো। প্রদোষের অন্ধকার অপসৃত হলো। দিব্য-চেতনার সঙ্গে যুক্ত হলো জীবন-সঙ্গীত।

আজ সংঘাত মুখর বিশ্বের অঙ্গনে শান্তি প্রতিষ্ঠার যে অভিযান চলেছে—তা সম্ভব হবে সেদিনই—যেদিন বৈজ্ঞানিক তার ল্যাবরেটরীর যন্ত্রপাতি ছেড়ে বসবে এসে মানবতার গবেষণাগারে। দেশনায়ক ঘোষণা করবে মানবকল্যাণের মহামন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে জন-জীবনের জয়-গান।

অংকের ফরমূলায়, ল্যাবরেটরীর কুক্ষিতে, এ শক্তি সঞ্চিত নেই। এ মহাশক্তির প্রতিটি অণু-পরমাণু ঘুমন্ত রয়েছে—

ঘুমন্ত রয়েছে মানুষেরই মনোলোকে। সেই মনোলোককে দেবলোক করতে পারলে জগতের মঙ্গল। মানুষের সমাজের শান্তি আসতে পারে।

•আমরা আজও বুঝে নিতে পারিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে। ঝুরি ঝুরি অধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় তাঁকে ভূষিত করে এক রকম মানুষের পৃথিবী থেকে বাদ দিয়ে রেখেছি। কিন্তু একবার চোখ খুলে তাকিয়ে দেখি না তাঁর আরব্ধ কর্ম-কীর্তি। শৈশবের খেলা শেষে যেদিন তিনি পদপাত করলেন কৈশোরে সেদিন থেকেই সুরু হলো তাঁর জীবন। মানুষের শত শত বছরের সংস্কারে হানলেন তিনি কঠোর আঘাত। ছোটজাতের মেয়ে ধনী কামারনীর হাতের অন্ন বই উপবিৎ উৎসব সম্পন্ন হলো না। চিনু শাঁখারী, খেঁতির মা এদের নিবেদিত অন্ন মিষ্টি খেয়ে তৃপ্ত হলেন নিষ্ঠাচারী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ছেলে গদাধর। তার পরে দেখলেন দক্ষিণেশ্বরে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের এঁটো পাতা মাথায় করে পরিষ্কার করতে। শুধু তাই নয়—ভবতারিণীর কাছে আকুল-

কণ্ঠে নিবেদন করলেন তিনি, 'মা আমায় রসে বসে থাকতে দে মা। আমি শুকনো নীরস হতে চাইনে।'

এই রস ও বশ হলো জীবন ও জিজ্ঞাসা।

জীবনকে অস্বীকার করবেন না ঠাকুর। গৃহী হলেন। কর্মময় বিশ্বের বিজনে ঘর বাঁধলেন। সেই আঙ্গিনায় আবার ডেকে আনলেন জীবন-বধূয়াকে।

উনবিংশ শতাব্দীর রাষ্ট্রীয় বিশৃঙ্খলায় হিন্দু গার্হস্থ্য-জীবনে এসে ছিল কঠোর আঘাত। ছন্নছাড়া হয়ে গিয়েছিল তাদের জীবন। আত্ম-সংযম, আত্ম-মর্যাদা, ধর্ম কর্ম কৃষ্টি ও ঐতিহ্য বলতে এতটুকু ছিল না অবশিষ্ট। বিষিয়ে উঠল হিন্দু-গৃহীর জীবন। ধ্বংসের পারে এসে দাঁড়াল তারা ক্ষয়ে যাওয়া জীবনের ছিন্ন-পত্র নিয়ে। দশাননের মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল দাঁড়াল। তাদের স্বমত ও স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে শান্তির সরসী রক্ত-রঙিন হয়ে উঠল। বেদ-প্রসবিনী ভারতবর্ষ লাঞ্ছনার চরম চত্বরে এসে দাঁড়াল। হাহাকার-হতাশায় ভরে গেল রামায়ণ মহাভারতের পুণ্যতীর্থ। মানুষের কণ্ঠে জাগল কাতর-ক্রন্দন। বাঁচাও! বাঁচাও!

বিপন্ন-জীবনের আহ্বানে সাড়া দিলেন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। রামরূপে সতা লয়ে ঘর বাঁধলেন মর্ত-তীর্থে। অসি ধরলেন এক হাতে। দশাননের দাপট থেকে মুক্ত করলেন মৃত্যুপথযাত্রিদের। গৃহীর চোখে তুলে ধরলে জীবনাদর্শের স্বর্ণলিপি। সন্ন্যাসীকে শোনালেন ত্যাগের মন্ত্র। গৃহীকে বললেন কমের সঙ্গে ধর্মের অণুকণা মিশিয়ে নিতে। সন্ন্যাসীকে দিলেন সাধনার মন্ত্র। গৃহীকে দিলেন আত্মতৃপ্তির আত্ম-উন্নতির আত্ম-সংযমের অমোঘ বাণী। সন্ন্যাসীকে উদ্বুদ্ধ করলেন বহুজন হিতায় আত্মত্যাগ করতে। গৃহীকে বললেন, 'গৃহে থেকেই ডাক না। পাঁকাল মাছের মতো থাক। মাঝে মাঝে নির্জনে বসে তাঁর ধ্যান কর।'

হিন্দু কৃষ্টির লাঞ্ছিত পতাকা আকাশের নীল গৈরিক করে দিল। শুনতে পেল মানুষ আবার নতুন করে শ্রীকৃষ্ণের বাঁশরী। দেখল চর্ম-চোখে রাম ও কৃষ্ণের ঐক্যবদ্ধ তনুকান্তি গদাধর ঠাকুরের মাঝে।

গৃহত্যাগী হাজরা। পড়ে গীতা, রামায়ণ ও মহাভারত।

ওদিকে বাড়িতে মা কেঁদে আকুল একবার ছেলেকে দেখবার জন্যে। ঠাকুর বললেন তাকে ঘরে যেতে। কিন্তু হাজরা গেল না। শোকে-দুঃখে হাজরার মা মারা গেলেন।

রাগে লাল হয়ে বললেন ঠাকুর—

বললেন হাজরাকে, 'মা কেঁদে কেঁদে মরে গেল, ও আবার গীতা পড়ে, ধর্ম সাধনা করে।'

পথ এড়িয়ে ধর্ম হয় না। মানুষের কান্নার অশ্রু যদি না মুছিয়ে দিতে পারলে তবে কিসের ধার্মিক? সংসারও করতে হবে। সুখ-দুঃখের ধারও ধারতে হবে। আবার সে হোমবহ্নির দহন বেদীর 'পর বসে দহনোত্তরণে দয়ানিধিকেও ডেকে আনতে হবে। জীবন শুধু একটা ভাবে ভরা ফানুস নয়। তাকে আকাশে উড়িয়ে দিলেই সে ওড়ে না। মাটির উপরে তাকে নেমে আসতে হয় পৃথিবীর বুকে। সখ্যতা স্থাপন করতে হয় মানুষের সঙ্গে। তাদের সবার মঙ্গলের মাঝ দিয়ে তৃপ্তিলাভ করতে হয়। প্রদীপ জ্বলে। আলো দেয়।

কেমন করে?

তাকে পুড়িয়ে পুড়িয়ে ছাই করে। ছাই হতে হবে বিশ্বদহনের অগ্নিতে। পালালে চলবে না।

বলেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ সারদামণিকে—'দেখ, আমি জানি সকল রমণীই আমার জননী। তথাপি তোমার ধর্মসঙ্গত অধিকার আমি স্বীকার করতে বাধ্য। তুমি আমার স্ত্রী। এখন তুমি যা বলবে তা-ই করতে প্রস্তুত।'

কিন্তু নিবাত নিষ্কম্প দীপ-শিখাটির মত সারদামণি গেলেন অন্য পথে। স্বামীর সাধনায় সমর্থা প্রেমের রাধিকা হয়ে বসলেন তিনি—

বসলেন মহামুক্ত মানুষ শ্রীরামকৃষ্ণের পদপ্রচ্ছায়ে। তাই বলছিলাম, গৃহকে তো তিনি অস্বীকার করেন নি। বলেন নি তো জগৎকে মিথ্যা। বরং ক্ষমায়, প্রেমে, মমতায়-সমতায় মানুষের পবিত্র-তীর্থ করে তুলতে বলে গেছেন জগৎ-সংসারকে।

জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ বিজয়কৃষ্ণ

সংসারে দুঃখ আছে। আছে কান্না। প্রেম, ভালবাসা, প্রীতি এবং প্রণয়ও আছে।

কিন্তু এই সব-কিছু থেকেও কি যেন নেই ব'লে মানুষ জীবন মন্থন করে। খুঁজে খুঁজে হয়রান হয় একটা অদৃশ্য অজ্ঞেয় বস্তু। সেখানে যেতে পারলে না জানি কত শান্তি! কত তৃপ্তি!

সে বস্তুটি কি?

প্রাণের দোসর। বন্ধু।

জীবনের চলার পথে চলতে গিয়ে যখন নিভে আসে পথের আলো, ভেসে আসে কর্ণরন্ধ্রে কান্নার কাতরিমা, এ বন্ধু আসে তখন। খুলে দেয় আলোর দুয়ার। অপসৃত করে তামসী শর্বরীর উলঙ্গ-উচ্ছ্বাস। মন তখন খুশীভরে বাহু বাড়িয়ে তাকে টেনে আনে বক্ষে। বলে চুপি চুপি ধীরে ধীরে—তুমি কোথায় ছিলে এতদিন? জগতের সমস্ত দুঃখ দিয়ে আমায় বেঁধে দিয়েছ লক্ষ কাজে। আমি কি এত বহন করতে পারি! তুমি এলে আমার সব বোঝা হাল্‌কা হয়ে যায়। তুমি না এলে আমি সব হারিয়ে বসে থাকি। পারি না পথ চলতে। তুমি আমার সঙ্গে থেকো।

ঠিক এমনি কাতর-ক্রন্দন নিবেদন ক'রে একদিন আকুল হয়ে গিয়েছিলেন শ্রীপাঠ শান্তিপুরের শ্রীমদদ্বৈত আচার্য।

সে ত কত যুগের অতীত ইতিহাস। তবু ভালো লাগে ভাবতে। ভাবতে ভালো লাগে স্মৃতির বাসরে স্বর্ণলেখ কাহিনীর কথা। সে যেন স্বপ্ন দিয়ে তৈরী। শুচিতায় স্নাত।

এক-দুই-তিন ক'রে ক'রে পেরিয়ে গিয়েছে চারশ'টা বছর। কিন্তু হৃদয়ের অনুভূতির সঙ্গে তার যেন একটা অদ্ভুত মিল এখনো খুঁজে পাই। যখনই মনের দিকে ফিরে তাকাবার এতটুকু অবসর পাই, তখনই ভাবনার ভবনে প্রাণের দীপ জ্বেলে বসি। তাকিয়ে থাকি অপলক নয়নে। আহ্বান করি অতীতকে—'হে অতীত কথা কও।' আমার অতীত সুন্দর হয়ে আসে। বসে থাকে না সে অনন্ত রাতের আসনে চুপটি ক'রে। অতীত কথা কয়। আমার প্রসুপ্ত চেতনাকে করে উদ্দীপ্ত। আমি আনন্দে আত্মহারা হয়ে চলে যাই পেছনের ফেলে-আসা দিনে।

চারশত বছর অতীত হয়ে গিয়েছে।

অতীত হয়ে গিয়েছে অনেক দুঃখ-কান্নার দিন। তবুও ভুলতে পারেনি মন আমার বাঙলা মায়ের প্রশান্ত দীপ্ত সাধক-সন্তানের তনুশ্রী। ভুলতে পারেনি তাঁর জীবন-কাব্য।

বাঙলার ভাগ্যাকাশে সেদিন ছিল একখানা ম্লান-সন্ধ্যা। অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে আসছিল দিগ্‌বলয়। প্রলয়ের শত প্রহরণ সমস্ত বঙ্গদেশকে সজোরে নাড়া দিচ্ছিল থেকে থেকে। ভক্তপ্রাণ অদ্বৈতাচার্যের অন্তর মথিত হলো। নয়নাশ্রুতে সিক্ত হলো বক্ষদেশ। মানুষের দুঃখে ডুকরে কাঁদলেন। ডাকলেন মিনতি-করুণ কণ্ঠে দুঃখত্রাতা পতিতপাবন শ্রীহরিকে। বললেন কেঁদে কেঁদে—

ওগো, তুমি না দয়াল ঠাকুর? যদি তাই হবে, তবে কেন জীবের জীবনে এত কান্না, এত দুঃখ?

ভক্তের কাতর-কান্নায় সাড়া দিলেন ভগবান। নেমে এলেন তিনি, নেমে এলেন নররূপে নদীয়ার পুণ্যধন্য পীঠস্থানে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু।

কোল দিলেন কলিহত জীবকে। হরিনামের রস-বন্যায় রিক্তমরু সিক্ত হলো। প্রেম-তরঙ্গের লহরে লহরে ভেসে চলল মানুষ। অবগাহন করল প্রশান্তির পীযূষধারায়। পেল মুক্তি। উদ্ধার হলো। কিন্তু কালের গতি হয়ে এলো মন্থর।

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অন্তর্ধান হলো। ধর্মে ঢুকল মালিন্য। আদর্শ থেকে ভ্রষ্ট হলো মানুষ। দেখা দিল নানা দল-উপদল। কর্তা-ভজা ,কিশোরী সাধকদের প্রভাবে প্রস্নিগ্ধ নিরাবিল বৈষ্ণব ধর্মের মাঝে ঘুণ ধরল। জনতীর্থ রূপান্তরিত হলো কলুষ ভূমিতে। মহৎ জনেরা হাহাকার করলেন। অন্তরের বেদনা জানালেন অন্তরতমের কাছে। লুপ্তপ্রায় সার্বভৌম বৈষ্ণব ধর্ম উদ্ধারের প্রচেষ্টায় তৎপর হলেন।

এমনি দিনে বেদনার জঠর মন্থন ক'রে এলেন শান্তিপুর শ্রীমদদ্বৈত বংশে আর এক মহাপুরুষ। নাম আনন্দকিশোর।

ধর্ম-চর্চা ও পূজা-পার্বণের মধ্য দিয়ে দিন কাটে আনন্দের। শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করতে করতে হয়ে পড়েন ভাবাবিষ্ট। দু'চোখ দিয়ে ঝরে অজস্র অশ্রু-ধারা। পুলক, স্বেদ, কম্পন একে একে প্রকটিত হলো তাঁর দেহে। রোমকূপ দিয়ে নির্গত হয় শোণিত। সর্বাঙ্গ গেল রক্তাক্ত হয়ে। আনন্দকিশোর আনন্দে আত্মহারা। কখনো হাসেন, কখনো কাঁদেন। আবার কখনো বা নৃত্য ক'রে ক'রে ডাকেন তাঁর শ্যামসুন্দরকে।

শুধু কি তাই ?

একদিন কি যেন খেয়াল হলো তাঁর। নিত্যপূজার শালগ্রাম শিলা বাঁধলেন গলায়। স্মরণ করলেন শ্যামসুন্দরকে। যাত্রা করলেন, যাত্রা করলেন জগন্নাথ-দর্শনে।

শান্তিপুর থেকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করতে করতে চললেন শ্রীক্ষেত্রের পথে। কেটে গেল পুরো একটি বছর। মৃত্তিকা-ঘর্ষণে ঘা হয়ে গেল

দিব্যানন্দ সাধকের বক্ষঃস্থলে ও জানুতে। রক্ত ঝরল। সিক্ত হলো বসন। জড়িয়ে নিলেন নেকড়া। তবুও বিরত হলেন না তিনি পথ চলতে। অবশেষে এসে উপনীত হলেন শ্রীক্ষেত্রে। এই আনন্দ-কিশোরের পুত্রই হলেন বিজয়কৃষ্ণ।

বিজয়ের আবির্ভাবের পূর্বে সংঘটিত হয়েছে অনেক অলৌকিক ঘটনা। দু-একটি তুলে ধরছি—

রাসপূর্ণিমার প্রস্নিগ্ধ-রজনী।

প্রশান্ত পরিবেশ। জোছনার ধারা চলেছে রজত উচ্ছ্বাসে। ধরণী সুন্দর। বইছে মৃদু মধুর মলয়। দেবাঙ্গনে ঘণ্টা বাজছে। বাজছে শঙ্খ আর কাঁসর। মুখর মুগ্ধ রাত। থেকে থেকে হুলুধ্বনি দিচ্ছে দিগঙ্গনারা।

বিজয়ের মা স্বর্ণময়ী ফিরছেন ঘরপানে—

ফিরছেন শ্যামসুন্দরকে অন্তরের প্রণতি জানিয়ে।

স্বচ্ছ পথ।

পথে নেই কো আঁধার। এ যেন দিনের চেয়েও উজ্জ্বল। পথ চলতে চলতে সহসা চমকে উঠলেন স্বর্ণ। দাঁড়ালেন থমকে। তাকিয়ে রইলেন অপলক নয়নে।

কি দেখছেন তিনি জাগর নয়নে?

দেখছেন দেব-শিশুর আভাতি। এ যেন প্রেমে জ্যোতির্ময়। ছন্দে অপূর্ব। স্নিগ্ধ সৌম্য শান্ত উজ্জ্বল তনু-কান্তি।

এগিয়ে আসছে—

এগিয়ে আসছে স্বর্ণময়ীর কাছে।

শুধু কি তাই?

শিশু ঢুকল এসে তাঁর পিছু পিছু ঘরে। ঘরে ঢুকল স্বর্ণময়ীর আঁচলখানা ধরে।

আবেশে অবশ হলো তাঁর দেহ। তন্ময় হলেন দিব্যানন্দে। অধীর হলো চিত্ত। তাকালেন চোখ মেলে।

চম্‌কে উঠলেন। ডুক্‌রে কাঁদলেন। হাহাকার-হতাশায় ভরে গেল অন্তর। নেই, নেই শিশু, নেই স্বর্ণর দর্শন-তীর্থে। মনটা বিলাপ করল—কই গো, কোথায় গেল সে প্রেমের দুলাল।

মূর্চ্ছিত স্বর্ণ। ব্যথায় বিকল। বক্ষে সঘন দোলা। সিক্ত নয়ন জলে। ঘুমিয়ে পড়লেন তিনি, ঘুমিয়ে পড়লেন বেদন-ব্যথার রিক্ত রোদন রেখে।

রাত গভীর।

শৃগালের নিশীথ চীৎকার। মাঝে মাঝে ডাকছে দু'একটি নৈশ বিহগ। বনের বুকে ঘন নিঃস্বন। নদীর বুকে দোলা। আর স্বর্ণময়ীর স্বপ্নে জাগে শিশু। অপূর্ব তার রূপ! অনিন্দ্য তার কান্তি! মধুর কণ্ঠে সোহাগ ভরে বলে—

বলে স্বর্ণময়ীর কাছে এসে, 'মা, আমি তোমার কাছে এলাম।'

দিন যায়। স্বর্ণময়ী ভাসেন আনন্দের অমিয়-লহরে। আকাশে, বনে, বৃক্ষে ও জলে দেখতে পান তিনি রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি। একাকী শুয়ে থাকেন, পার্শ্বে এসে শিশুটি যেন ঠাঁই নেয়। আলো হয়ে যায় ঘর। ভার হয়ে যায় স্বর্ণর দেহ।

এমনি দিনে আনন্দকিশোর ফিরে এলেন—

ফিরে এলেন গাঁয়ে।

এ স্বপ্ন তো স্বপ্ন নয়—বাস্তব। তিনিও দেখেছেন তীর্থধামে বসে। শুনেছেন প্রভুর আগমন আশ্বাস।

১২৪৮ সন। ১৯শে শ্রাবণ, সোমবার।

সেই ঝুলন পূর্ণিমার মধুমুগ্ধ বিভাবরী। কৃষ্ণ-গুণগানে মুখরিত। ঘরে ঘরে বাজছে শঙ্খ-ঘণ্টা। সকলের কণ্ঠেই কৃষ্ণ-করুণা প্রার্থনা।

এমনি মধুর রজনীতে স্বর্ণময়ীর প্রসব বেদনা হলো।

বাড়ীর পেছনে পিটুলী গাছ। জমিটুকু আচ্ছাদিত কচুবনে। বর্ষার জলে আপ্লুত।

স্বর্ণময়ী গিয়ে আশ্রয় নিলেন সেখানে।

শিশু ভূমিষ্ঠ হলো। ভূমিষ্ঠ হলো কচুবনে পিটুলী গাছের প্রচ্ছায়ে।

স্বর্ণময়ী শিশুর পানে তাকিয়ে কাঁদলেন।

কেন ?

এ-যে মৃত। চেতনাহীন। জড়! কিন্তু অপূর্ব! সুন্দর! অনিন্দ্য!

অমনিধারা কিছু সময় কাটল। খোঁজ পড়ল স্বর্ণময়ীর। এলো সবাই। দেখল এসে, দেবশিশু অঙ্কে লয়ে শায়িত স্বর্ণ।

পূর্ণিমার রজতকান্তিও যেন গেছে ম্লান হয়ে—ম্লান হয়ে গেছে শিশুর তনুভাতির কাছে। আনন্দে সকলে জয়ধ্বনি করল।

ধন্য হলো নদীয়ার শিকারপুর-নিকটস্থ দহকুল গ্রাম।

মানব-মুক্তির মহানায়ক আবির্ভূত হলেন বাঙলার জঠরে।

এ বিজয় কি আর যে-সে ছেলে ?

পূজারী এসে দরজা খুলবে—

দরজা খুলবে শ্যামসুন্দরের মন্দিরের। বিজয় দাঁড়িয়ে আছে তারই অপেক্ষায়।

কেন ?

খেলছিল বসে বিজয়। কে নাকি ছিল ওর সঙ্গে। খেলছিল সে-ও।

হঠাৎ যেন কি হলো। শিশু বিজয়কৃষ্ণ দু'হাত দিয়ে ঠেলতে লাগল শ্যামসুন্দরের দরজা। তার কাঠের রঙীন বল পাচ্ছে না খুঁজে।

খুঁজে পাচ্ছে না, তা শ্যামসুন্দরের কাছে কি ? শ্যামসুন্দর কি আর বল নিয়ে এসেছে ?

হ্যাঁ। 'এই শ্যামসুন্দরই পালিয়ে এসেছে আমার বল নিয়ে। ও—ও-যে খেলছিল আমার সঙ্গে।'

পূজারী এলো। খুলল দরজা। কিন্তু বিজয়কে দিল না সেখানে প্রবেশ করতে।

কেন ?

পৈতে হয়নি যে। কেমন ক'রে ঢুকবে সে দেবাঙ্গনে।

বড় ব্যথা পেল বিজয়। অভিমানে দুঃখে বলল শ্যামসুন্দরকে,—'আমার বল নিয়ে পালিয়ে এলে। আবার আমাকে ঘরে যেতে দেওয়া হলো না। আচ্ছা, কাল আবার খেলতে এসো। আমি এর প্রতিশোধ না নিয়ে জল গ্রহণ করছি না।'

সত্যিই তাই করল সে। সেদিন রাত্রে আর কিছু খেল না সে। মা স্বর্ণময়ীর কত সাধ্য-সাধনা। কিন্তু অভিমানী অন্তর এতটুকু টলল না।

শুয়ে পড়ল বিজয়—শুয়ে পড়ল না খেয়েই।

স্বর্ণময়ী আর কি করবেন। ভাত ঢেকে রেখে শুয়ে পড়লেন।

বিজয়ের চোখে কি আর ঘুম আছে ?

সে তো তার প্রতিদ্বন্দ্বী শ্যামসুন্দরকেই ডাকছিল বসে। সে এমন ডাক—যাতে পাষাণও গলে যায়। শ্যামসুন্দর এলো—

এলো বিজয়ের মান ভাঙ্গাতে। দু'জনে কথা কইল। সহসা ঘুম ভেঙ্গে গেল স্বর্ণময়ীর। তিনি রইলেন উৎকর্ণ হয়ে। শুনতে লাগলেন বিজয়ের মুখে, 'যাক, ঘাট মানলে। তাই ছেড়ে দিলাম। নইলে দেখাতাম একবার মজা।'

স্বর্ণময়ীর সমস্ত শরীর যেন ভার হয়ে গিয়েছে। আবারও শুনলেন তিনি, বিজয় বলছে, 'আমি না হয় তোমার উপর রাগ ক'রে খাইনি। কিন্তু তাই ব'লে তুমি কেন খেলে না ?'

বিস্ময়ে স্তব্ধ স্বর্ণময়ী। শ্বাস ফেলছেন ধীরে।

'বেশ, বেশ, দু'জনে এক সঙ্গে খাই এস।'

ঢাকনা তুলল ভাতের। বসল খেতে দু'জনে। বেশ মনের আনন্দে হেসে কথা কয়ে ভাত খেতে লাগল দু'জনে।

ভক্ত আর ভগবান। প্রভেদ নেই তো কিছু। ভক্তের অন্তর যদি কাঁদে, তবে কোন সাধ্য নেই অন্তরতমের দূরে থাকবার।

তাইতো বিজয় স্বর্গের দেবতাকে মানুষ ক'রে নিয়ে এসেছে মর্ত্যের ঘরে।

প্রেমের প্রবাহে দু'জন মিলে এক হয়ে গেল।

এমনি ক'রে কেটে গেল শৈশবের দিনগুলি। পদপাত করলেন কৈশোরের তীর্থভূমিতে। কর্ম্মমুখর বিশ্ব যেন হাতছানি দিয়ে ডাকল তাঁকে। এগিয়ে চললেন তিনি—

এগিয়ে এলেন দুর্গম বন্ধুর পথে। ঝাঁপ দিলেন। সমুদ্র-মন্থনে করলেন আত্মনিয়োগ। প্রবেশ করলেন গোবিন্দ ভট্টাচার্যের টোলে। অশ্রান্ত ধৈর্য। অটল সংকল্প। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল অপূর্ব মেধা! ফলে বিজয়কৃষ্ণ তাক লাগিয়ে দিলেন নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলীকে। বিস্ময় প্রকাশ করলেন তাঁরা বিজয়ের বিদ্যাবত্তার পরিচয়ে।

দিন চলল এগিয়ে। উপনয়ন হয়ে গেল। মা স্বর্ণময়ী সন্তানের কানে রাখলেন মন্ত্র। এ তাঁদের কুলপ্রথা। উপগুরু হলেন সদাচারী পণ্ডিত আচার্য কৃষ্ণগোপাল গোস্বামী। বিজয়ের জীবনের পট-পরিবর্তন হলো। শ্যামসুন্দরের পূজার অর্ঘ্য সাজান বিজয়—

অর্ঘ্য সাজান বনের কুসুমে আর মনের মাধুরীতে। প্রাণের পরগণায় প্রেমময়ের আসন পেতে রাখেন ভক্ত। মানুষের সেবা-ধর্মের পবিত্র মন্ত্র অঙ্কুরিত হয় অন্তরে। ধীরে ধীরে বিবেক-বিজ্ঞানী হয়ে ওঠেন বিজয়কৃষ্ণ।

টোলের অধ্যয়ন শেষ হলো। ভর্তি হলেন এসে কলকাতায় সংস্কৃত কলেজে। আঠারো বছরের ছেলে। সুঠাম দেহ। সুন্দর তনু। অপূর্ব রূপ-লাবণিতে উজ্জ্বল। দেখলে আর নয়নের পলক পড়তে চায় না। এমন ছেলেকে শ্রীমতী যোগমায়ার পার্শ্বে বেশ মানাবে। সম্বন্ধ স্থির হয়ে গেল।

কোথায় ?

শিকারপুর গ্রামের রামচন্দ্র ভাদুড়ীর বড়মেয়ের সঙ্গে। আঠারো বছরের ছেলে বিয়ে করলেন ছ' বছরের কন্যা যোগমায়াকে। এ যেন শ্রীগৌরাঙ্গের পার্শ্বে বিষ্ণুপ্রিয়া।

তখন ছিল ভারতবর্ষের ভাগ্যাকাশে দুর্দিনের মেঘছায়া। মোগল সাম্রাজ্যের সৌধ-শিখরে রাত্রির অবগুণ্ঠন। মহারাষ্ট্রের গতিবেগ মন্থর। পাশ্চাত্য প্রভাবে দেশবাসী দিশাহারা। শুধু তাই নয়—ব্যভিচার, উচ্ছৃঙ্খলতার প্লাবন জাগল মহাভারতের পুণ্যতীর্থে। জাঁকিয়ে বসল এসে পাদ্রির দল। শুরু ক'রে দিল তাদের খ্রীষ্টধর্ম প্রচার। কিন্তু এ প্রচারের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন রইল তাদের রাজনীতির দুষ্ট অভীপ্সা। চাইল তারা, চাইল বঙ্গবাসী তথা ভারতবাসীকে শিক্ষায় দীক্ষায় আচারে বিচারে খাঁটি সাহেব ক'রে তুলতে। দলে দলে লোক পড়ল ঝুঁকে। পরপদলেহী আপন ধর্মে কটাক্ষ হেনে গ্রহণ করল খ্রীষ্টধর্ম। গা ভাসিয়ে দিল বিলাসের পঙ্ক অঙ্কে। বিরামবিহীন হ'য়ে তারা ছুটল, ছুটল নব-ধর্মের রসাস্বাদন করতে।

বিজয়কৃষ্ণেরও দুই বন্ধু খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হলো। বড় ব্যথা পেলেন বিজয়। রাত্রির বাসরে একাকী চোখের জল ফেললেন। কাঁদলেন অঝোরে। মনটা বিষিয়ে উঠল। হিন্দুধর্মের বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠানের প্রতি এলো একটা অশ্রদ্ধা। তিনি মর্ম দিয়ে উপলব্ধি করলেন একটি সত্য।

কি ?

বাহ্যিক আবরণে আর রক্ষা করা সম্ভব নয় হিন্দুধর্ম। এবারে দরকার অন্তর-ধর্মের স্পর্শানুভূতি। আত্ম-জাগৃতির অমোঘ মন্ত্র। গোস্বামী প্রভু ঘোর বৈদান্তিক হয়ে পড়লেন। মর্মের মধুকোষে 'অহং ব্রহ্ম' এই সত্য সোনার জলে লেখা হয়ে গেল। ধ্যান আর ধ্যেয় অভেদ জ্ঞান করতে লাগলেন তিনি। মধ্যাহ্নের মত প্রদীপ্ত হয়ে উঠল আত্ম-বিশ্বাসের স্বর্ণ-সূর্য।

ঠিক এমনি দিনে একদা শুনতে পেলেন তিনি—

শুনতে পেলেন দেববাণী। কে যেন ব'লে গেল—'পরলোক চিন্তা কর।' জীবনের গ্রন্থে আর একটা পাতা সংযোজিত হলো।

বাঁকুড়ায় এসেছেন বিজয়কৃষ্ণ। এখানে দেখা হয়ে গেল শিববাড়ির কিশোরীলাল, হারাধন বর্মণ ও গোবিন্দচন্দ্রের সঙ্গে। এরা সকলেই ব্রাহ্ম সমাজের চেলা। গোস্বামী প্রভু এদের ব্যবহারে মুগ্ধ হলেন। তারা জানাল বিজয়কৃষ্ণকে আমন্ত্রণ—

আমন্ত্রণ জানাল ওরা কলকাতার ব্রাহ্ম সমাজে উপস্থিত হবার জন্য।

বাঁকুড়া থেকে ফিরে এলেন বিজয়কৃষ্ণ কলকাতায়। পড়লেন এক বন্ধুর খপ্পরে। বিজয়ের সমস্ত টাকাকড়ি চুরি ক'রে বন্ধু পালিয়ে গেল। ভাগ্যের বিড়ম্বনা। কপর্দকশূন্য হয়ে পড়লেন বিজয়। ঠাঁই নেই মাথা গুঁজবার। সংস্থান নেই আহারের। রিক্ত হস্তে বিচরণ করতে লাগলেন পথে প্রান্তে।

কিন্তু এমন ক'রে দিন চলবে কি ?

ভাবনার প্লাবনে বিধ্বস্ত হয়ে যায় বিজয়ের অন্তর। নিরুপায় বিজয়। হাজির হলেন বিদ্যাসাগরের কাছে। কিন্তু নিষ্ফল প্রয়াস। ভগ্নমনে তাঁকে আসতে হলো ফিরে—

ফিরে আসতে হলো বিদ্যাসাগরের কাছ থেকে। তিনি যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ—আর কাউকে করবেন না সাহায্য।

বিশীর্ণ দেহ। বীতনিদ্র আঁখি। বিশুষ্ক বদন। শ্লথ পদসঞ্চার। সম্মুখে ধূ-ধূ করে নিরাশার সাহারা। এবারে কার কাছে যাবেন তিনি? কে দেবে তাঁর এ বিপদ মুহূর্তে অভয়ের আশ্বাস? বড় ভেঙ্গে পড়লেন। নিবেদন করলেন একখানা আবেদনপত্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে। কিন্তু সেখান থেকেও ফিরতে হলো তাঁকে ব্যর্থতার বেদনা লয়ে। দেবেন্দ্রনাথ ছিঁড়ে ফেললেন পত্রখানা। অদৃষ্টবাদী বিজয় ব্যথা পেলেন বটে—কিন্তু রুষ্ট হলেন না। নির্ভর করলেন আত্মসত্যের প'র। দুঃখকে জানালেন অভিনন্দন। অনাহারে কেটে গেল দু'দিন। রাত্রির শয়ন-শয্যা হলো গোলদীঘির পাড়ে সংস্কৃত কলেজের প্রশস্ত বারান্দাখানা। এমনি দিনে দেখা হলো এক পরিচিত পরিজনের সঙ্গে। দিলেন তিনি চার আনার পয়সা। বললেন কিছু জলযোগ করতে। নিস্পৃহ বিজয় হাত পেতে গ্রহণ করলেন তা। তবুও ভালো। গোবি-সাহারার বুকে এ যেন চেরাপুঞ্জীর একবিন্দু বারি। তা হোক্। মানুষের মহত্ত্বের বিকাশ ঘটে এই ক্ষুদ্র ঘটনার মধ্য দিয়েই। বিজয় তাঁর ব্যবহারে সত্যই মুগ্ধ হলেন। অন্তরের অজস্র অভিনন্দন পাঠালেন নীরব সাধক।

চলে গেলেন তিনি।

এমনি সঙ্কট মুহূর্তে এসে হাজির হলো বিজয়ের সেই ক্লেশদায়ক বন্ধু। স্তম্ভিত হয়ে গেলেন বিজয়। বিস্ময়ে স্তব্ধ। তাকিয়ে রইলেন অশ্রুসজল চোখে, তাকিয়ে রইলেন বন্ধুর অনাহারক্লিষ্ট ক্ষুধাক্লিন্ন মুখখানার দিকে। চোখ ফেটে এলো কান্না। গড়িয়ে পড়ল জল। বিতাড়নের উদ্ধতি না তুলে প্রেম-প্রশান্ত বাহু বাড়িয়ে আহ্বান করলেন বন্ধুকে বিজয়। চার আনার সদ্‌গতি করলেন তাকে নিয়ে।

যার অন্তর ক্ষমায় স্নিগ্ধ, প্রেমে জ্যোতির্ময়, তার পরশ-প্রশান্তিতে এসে বন্ধু বিমুগ্ধ হলো। উঠল এসে দু'জনে মিলে এক ভদ্র ব্যক্তির বাড়ীতে। এক রকম দুঃখের অবসান হলো।

প্রশমিত হয়েছে অন্তরাগ্নির দহন। সম্মুখে ক্ষীণ আশার প্রদীপ হয়েছে প্রজ্জ্বলন্ত। বিজয়ের মনের নেপথ্যে এসে আভাসিত হলো বাঁকুড়ার বন্ধুত্রয়। তিনি যেন শুনতে পেলেন তাদের আমন্ত্রণ। মনে করলেন যাবেন তিনি, যাবেন ব্রাহ্ম সমাজের সভায়।

সেদিন ছিল বুধবার। বক্তৃতা করবেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিষয় হলো—'পাপীর দুর্দশা ও ঈশ্বরের করুণা।'

বিজয় এসে হাজির হলেন। মন ঢেলে শুনলেন বক্তৃতা। শুনলেন দেবেন্দ্রনাথের কাব্যমধুর ভাষণ। বিজয়ের অভাবের ঘরে এলো ভাব-সমুদ্রের উচ্ছ্বাস। নয়নের নীরে ভেসে গেল চক্ষু। দেহের গ্রন্থিতে দেখা দিল কম্পন। এ বিশ্ব-প্রবাহের সঙ্গে যুক্ত হবার বিলোল বাসনায় অধীর হয়ে গেল তাঁর অন্তর। পেছনের দিনগুলোর কাহিনী একের পর এক এসে হাজির হলো তাঁর মানস-নয়নে। ব্যথায় বিমর্ষ বিজয় আত্মদহনের অগ্নিতে পরিশুদ্ধ করলেন নিজেকে। তার পরে জীবনের তীর্থপথে এসে দাঁড়ালেন।

গ্রহণ করলেন ব্রাহ্মধর্ম।

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দ।

দেখা হয়ে গেল কেশব সেনের সঙ্গে বিজয়কৃষ্ণের।

কোথায়?

কলকাতার 'সঙ্গত সভায়'।

এ যেন দুই মনোবিহঙ্গ। মিলেছেন এসে একই কুঞ্জে। যেমন কেশবচন্দ্র, তেমন বিজয়কৃষ্ণ। প্রজ্ঞায় স্নিগ্ধ। ভক্তিতে উচ্ছল।

অবাক-বিস্ময়ে উভয়ে উভয়ের পানে তাকিয়ে থাকেন—

তাকিয়ে থাকেন অপলক নয়নে। এমন অক্লিষ্ট কান্তি আর যেন ওঁরা দেখেননি কখনো। তাই তো দৃষ্টি পড়ে না চোখের। দেহ নড়ে না এতটুকু। ভাব-সমুদ্রে প্লাবন জাগে। মন মগ্ন হয়ে উভয়কে খোঁজে উভয়ের মাঝে।

আর ভাবনা নেই। এবারে সাফল্যের স্বর্ণালী সকাল। বিকিরিত হবে আলোর ছটা।

অপসৃত হবে রাত্রির অন্ধকার। মানুষ পাবে পথ। ফিরে আসবে আপন ধর্মে।

বিজয় বেরিয়ে পড়লেন—

বেরিয়ে পড়লেন দেশ-পরিক্রমায়। কেশব তুললেন মহানগরীর কেন্দ্র-বিন্দুতে শুদ্ধির আন্দোলন। অমন বক্তৃতা আর যেন কেউ কখনো শোনে নি।

শুধু বক্তৃতা নয়, শক্ত হাতে কলম ধরলেন তিনি। প্রথম আঘাত হানলেন ঝিমানো যুগের বুকে। লোক ছুটল দলে দলে। শুনতে এলো তারা তপনমোহনের মধুক্ষরা বাণী। যোগ দিতে লাগল ব্রাহ্ম সমাজে।

কিন্তু স্থবিরা রজনার নেশা তো কাটে না। আর একটি সমস্যার অঙ্কুর মাথা তুলে দাঁড়াল। কেশব চাইলেন পুরাতনের জীর্ণতায় নতুনের প্রাণ-চেতনা। চাইলেন রক্ষণশীলতার মাঝে উদারতার গিরি-গাম্ভীর্য। স্ত্রীরা পাবে স্বাধীনতা। হবে অসবর্ণ বিবাহ।

কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ পারলেন না একমত হতে। গুরু-শিষ্যে দ্বন্দ্ব বাধল।

বিভক্ত হলো সমাজ। কেশব সেনের দলে রইলেন বিজয়কৃষ্ণ। তাঁদের সমাজের নাম হলো 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ'।

আর দেবেন্দ্রনাথের সমাজের নাম হলো 'আদি সমাজ'।

দু'দলের ধারা চলল দু'দিকে।

পাদ্‌রিদের টনক নড়েছে। একটু চিন্তাক্লিষ্ট হয়ে পড়েছে তারা কেশব সেনের বক্তৃতায়।

একদিন ঘটল একটি ঘটনা। বিলেত থেকে সাহেব এসেছে। এসেছে অনুসন্ধান করতে তাদের ধর্মবিরোধী দলটির কার্যক্রম। তখন চলছিল ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজের ঘরে বক্তৃতা। সাহেব এসে ঢুকল সেখানে। অভ্যর্থনা জানালেন কেশবচন্দ্র। শুধালেন কেন তিনি এসেছেন।

সাহেব বিজয়কৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে বললেন, 'তোমাদের মধ্যে ঐ যে বসে আছেন ধীর স্থির অটল—কি নাম ওঁর?'

কেশবচন্দ্র বললেন, 'বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।'

সাহেব বলল, 'আমি জানি এবং বিশ্বাস করি, খ্রীষ্ট ভিন্ন পৃথিবীর নরনারীর আর কোন উপাস্য নেই। আর তাদের পাপভার মোচন করবার উপযুক্ত পুরুষই বা অন্য কে থাকতে পারে? এ-সব বিষয় জানবার জন্যেই আমি এসেছি তোমাদের কাছে। তোমাদের মধ্যে যিনি এখনও ত্যাগ করেননি উপাসনার আসন, যাঁর নাম বললে তুমি বিজয়কৃষ্ণ, আমি আলাপ করতে চাই তাঁর সঙ্গে।...কিন্তু আমার মন চাইছে না ওঁর উপাসনা ভঙ্গ করতে।'

ধ্যান ভাঙ্গল বিজয়ের। কেশব বললেন সব কথা খুলে। বিজয় এগিয়ে এলেন সাহেবের কাছে। বললেন, 'সাহেব, ধর্মমত অনেক প্রচার করেছেন, গ্রন্থাদিও পাঠ করেছেন অনেক এবং এখন ধর্ম প্রচার করতে ভারতবর্ষে আগমন করেছেন। ভাল, অনুগ্রহ ক'রে আমার কয়েকটি প্রশ্নের প্রথমে উত্তর দিন :—

'ধর্ম কাকে বলে? ধর্মের উৎপত্তি-স্থান কোথায়? আত্মা কাকে বলে? মায়া কি বস্তু এবং মায়া কাকে বলে? অসত্য কি এবং পাপ কি?'

সাহেব জর্জরিত হলো প্রশ্নবাণে। তাকিয়ে রইল অবাক-বিস্ময়ে। বলল এক সময়, 'এ সকল প্রশ্ন কেউ কখনও আমাকে জিজ্ঞেস করেনি। নিজের অন্তরেও কখনও উদয় হয়নি। ধর্ম সম্বন্ধে আর কিছু জানি না, কেবল জানি যীশুখ্রীষ্ট ও বাইবেল।'

বললেন তখন কেশবচন্দ্র, 'সাহেব, এ দেশের নাম ভারতবর্ষ। এ দেশ থেকেই সভ্যতা এবং ধর্ম প্রথমে গ্রীস দেশে যায়, সেখান থেকে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে সমস্ত ইউরোপে। এ ভারতবর্ষ যে মহাদেশের অন্তর্গত তার নাম এশিয়া। এই এশিয়ার উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে কোন একটি ক্ষুদ্র গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তোমাদের যীশুখ্রীষ্ট। তোমাদের অপেক্ষা আমরা খ্রীষ্টকে অধিক জানি এবং মহাপুরুষজ্ঞানে ভক্তি ক'রে থাকি। কিন্তু তিনি আমাদের উপাস্য নন। আমাদের উপাস্য তাঁর পিতা পরমেশ্বর। তিনি এক এবং অবিভক্ত। এই যে আমাদের দেখছ আমরাও সেই এক এবং অবিভক্ত ঈশ্বরের পুত্র। যদি তুমি ভারতবর্ষে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করতে চাও, তবে এখান থেকে ইংলণ্ডে ফিরে যাও এবং আমাদের প্রশ্নগুলো সেখানে গিয়ে বল। তার পরে প্রশ্নের যথার্থ জবাব জেনে এদেশে ফিরে এসো।'

সাহেব ফিরে গেল নতমুখে।

ব্রাহ্ম সমাজের বিভেদের সুযোগ নিয়ে মাথা তুলে দাঁড়ালেন প্রাচীন-পন্থীরা। স্থাপন করলেন তাঁরা হরিসভা। চাইলেন হিন্দুর হিন্দুত্বকে সংস্কারের জালে আবদ্ধ ক'রে রাখতে।

কিন্তু ফাঁকা কথায় তো অন্তরে সাড়া জাগে না। বাহ্যিক আবরণে কি আর অন্তর-মন্থন ঘটে? ভাড়া-করা বক্তার বক্তৃতায় প্রাণের জারক রস নিষিক্ত হলো না, কেবল কতগুলো নীরস শাস্ত্র-ব্যাখ্যার ধূলি উড়ল। দেউলে মন বহিরঙ্গার আনন্দে মুখর হলো। জোড় বিভেদ বাধল। সমাজে সমাজে, ধর্মে ধর্মে, আচারে মর্মে সর্বত্র একটা মত্ততার প্রকাশ

গেল। নব নাগরিক সভ্যতার কেন্দ্রপীঠ কলকাতা রূপান্তরিত হলো রণক্ষেত্রে।

আত্মদ্বন্দ্বে মত্ত মানুষ মধ্যাহ্নের মত প্রদীপ্ত হয়ে উঠল। দাঁড়াল এসে দুর্দিনের মুখোমুখি।

'যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায়চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম-সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥'

মর্ত্যতীর্থ দক্ষিণেশ্বরের বনকান্তার মুখর হলো। ফিরে তাকাল সকলে—

ফিরে তাকাল প্রজ্ঞাস্নিগ্ধ প্রেমপাগলের দিকে। শুনল মরম ঢেলে, 'ওরে, তোরা কে কোথায় আছিস্ আয়!'

দলমতনির্বিশেষে সকলের কানে পৌছল সে আহ্বান। ভাবের উদ্দীপন হলো।

হলো রাহুর বাহু শিথিল। অরুণোদয়ের সূর্যের মতো বিকিরিত হলো আলোর রোশনাই। ফুল ফুটল মরুতে। জোয়ার এলো ভাব-গঙ্গায়। মূর্তিপূজা-বিরোধীর দলও এলো এগিয়ে। কেশব দরজায় খিল এঁটে গোপনে পূজো করলেন শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিকৃতি। তন্ময় হলেন মাতৃ-সাধনায়।

দুরন্ত বিদ্রোহী কেশব মূর্তি-পূজকের পদপ্রান্তে পড়লেন লুটিয়ে। ভেসে গেল তাঁর কাঠিন্যের প্রাচীর। ভেঙ্গে গেল আজন্মের আত্ম-বিশ্বাস।

কেশবকে হারিয়ে বিজয়ের মন ভাঙ্গল। বন্ধুদের কাছে চিঠি লিখলেন তিনি, 'পূর্বে মনে করতাম, ব্রাহ্ম সমাজ চিরশান্তির স্থান, এখানে কোনও প্রকার গোলযোগ প্রবেশ করতে পারে না। এখন তার সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থা দেখে নিতান্ত ব্যথিত হয়েছি। এক-একবার মনে করি,

ব্রাহ্ম সমাজের যা হবার হোক, আর কোন প্রকার আন্দোলন করব না।
...অন্যায় অসত্যের প্রতিবাদ না করা পাপ, তাই উদাসীন থাকতে
পারি না।'

বলা প্রয়োজন, কেশবচন্দ্রের 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ' ভেঙ্গে গেল।
গোড়া পত্তন হলো নতুন সমাজের। নাম হলো তার 'নববিধান'।

'সাধারণ সমাজের' পুরোধায় এসে দাঁড়ালেন বিজয়কৃষ্ণ। শিবনাথও
এলেন তাঁর সঙ্গে। পূর্ববঙ্গের সমাজ থেকে বিজয়কে বরণ করল আচার্য-
পদে। সর্বত্র একটা ওলট-পালট হয়ে গেল। তবুও থামল না বাইরের
কোলাহল। ঝড়ের পূর্ব সংকেতে শঙ্কাকুল জনমানসের মধ্যাহ্নগগনে
দেখা দিল প্রদোষের প্রলয়লগ্ন। বিজয়ের মন ভাঙ্গল। কর্মমুখর বিশ্ব
থেকে ছুটি চাইলেন মনে মনে। কি হবে এ-সব ক'রে? ধরণীর এক
কোণে একরকম আপন মনের ভুবন রচনা ক'রে থাকতে পারলে তার
চেয়ে আর সুখের কি আছে?

সহসা মনের আরশিতে আভাসিত হলো কেশবের কয়েকটা কথা—
'তুমি ভক্তিযোগে সিদ্ধ হয়েছ।'

অতীতের স্মৃতি-বিজড়িত দিনগুলি মনের কেন্দ্রবিন্দুতে যেন সজীব
হয়ে ওঠে। জীবনের অলিখিত বাণীগুলি গুঞ্জরিত হয়। সুন্দরের স্বপ্ন-
সাধনায় তন্ময় বিজয়কৃষ্ণ বহির্বিশ্বের যোগবন্ধন ছিন্ন করবার মানসে
বিলোল হয়ে ওঠেন। ধীরে ধীরে মনের মণিকোঠায় পূর্বদিনগুলির ছায়া
পড়ে। মনে পড়ে আরো, মনে পড়ে সেই সব দিনগুলির কথা—যে সব
দিনগুলি ছিল একান্ত আপনার অন্তরের অচিত সম্পদ।

ঘুমন্ত পৃথিবীর কোলে একাকী বসে থাকেন বিজয়। ভাবনার
ভবনের দুয়ার খুলে দিয়ে রাত্রির বৃন্তে দিবসের তনুকান্তি প্রত্যক্ষ করেন
তিনি। দূরতম দিনগুলির মধুমুগ্ধ আবর্তে যেন ভেসে ওঠে কিসের

একটা জ্যোতিচ্ছটা। তন্ময় হয়ে যান তিনি, তন্ময় হয়ে যান সে আলোর উৎস-সন্ধানে।

হ্যাঁ, মনে পড়েছে এবারে। দেখেছিলেন তিনি, দেখেছিলেন একদিন।

কি ?

দেখেছিলেন স্বয়ং অদ্বৈতাচার্যের আগমন-আভা। ঠিক এমনি ছিল সে সুন্দর কান্তি।

এক এক ক'রে মনে পড়ে গেল সব।

রাত গভীর। ঘুমিয়ে পড়েছে শ্রান্ত ধরণী। একটু একটু হাওয়া খেলে যাচ্ছে বাইরে। মাঝে মাঝে ভেসে আসছে তারই ক্ষীণ তান। বিজয় বসেছেন ধ্যানে। ডাকছেন তাঁর শ্যামসুন্দরকে। হঠাৎ চমকে উঠলেন তিনি। শুনতে পেলেন যেন কিসের একটি শব্দ। কান পেতে রইলেন। কে যেন দরজা ঠেলছে। ঘরে আসতে চাইছে। বিজয় দরজা খুলে দিলেন। আবির্ভূত হলেন কয়েকজন জ্যোতির্ময় পুরুষ। আলোয় আলোময় হয়ে গেল ঘর। অবাক দৃষ্টিতে বিজয় তাকিয়ে রইলেন, তাকিয়ে রইলেন তাঁদের পানে।

বললেন তার মধ্য থেকে একজন, 'আমি অদ্বৈতাচার্য'।

আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেখিয়ে আবার বললেন তিনি, 'ইঁনি মহাপ্রভু। ইঁনি নিত্যানন্দ। আর ঐ যে ব'সে আছেন, উনি হচ্ছেন শ্রীবাস।'

প্রত্যক্ষ পরিচয় হলো বিজয়ের সঙ্গে। হলো আলাপন। অবশেষে বিজয়কে বললেন, 'তোমার ব্রাহ্ম সমাজের কাজ শেষ হয়েছে। এখন মহাপ্রভুর শরণাপন্ন হও। এখনই তিনি তোমাকে দীক্ষা দেবেন। শীঘ্র স্নান ক'রে এসো।'

স্নান সমাপনান্তে দীক্ষা হয়ে গেল। পড়ে রইল সিক্ত বসন কুয়ো-তলায়। ভোর হলে যোগমায়া তা দেখে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে ফিরে এলেন

বিজয়কৃষ্ণের কাছে। শুনলেন সব কথা। আনন্দে দু'চোখ দিয়ে নির্গত হলো অশ্রু। বললেন যোগমায়া—

বললেন বিজয়কে, 'তুমি ভাগ্যবান।'

তখন বিজয় ছিলেন কেশবের একান্ত অন্তরঙ্গ। বলেছিলেন সব কথা কেশবের কাছে। বিস্ময়াবিষ্ট হয়েছিলেন কেশবও। কিন্তু সাবধান করে দিয়ে বলেছিলেন বিজয়কে, 'এ-কথা আর কাউকে বলো না। বিশ্বাস করতে চাইবে না কেউ। বলবে তোমাকে পাগল। করবে উপহাস।'

সেই কেশবও আজ নেই তাঁর পাশে। মন টিকবে কেমন ক'রে? সমস্ত পৃথিবীটা কেন গিয়েছে শূন্য হয়ে। মায়ার ছায়া ধীরে ধীরে মুছে যায়। দূরবিসারী আকাশের অনন্ত যেন হাতছানি দিয়ে ডাকে। অন্তরের কুঞ্জে ডেকে ওঠে কোকিল। বিজয় ডুবে যেতে চান আত্মরতির সুখ-সায়রে। অবগাহন করতে চান প্রেম-সমুদ্রের পীযূষ ধারায়। জীবনের মুখর মধ্যাহ্ন থেকে মুখ ফিরিয়ে বসেন নীরবতার প্রশান্ত স্তব্ধতায়। অনন্ত বস্তুর মাঝে খোঁজ করেন জীবনের সার্থকতা। উপলব্ধির অমৃত-প্রবাহে দিনের পর দিন এগিয়ে যান অশান্ত অন্তরে।

'ভূমৈব সুখম্ নাল্পে সুখমস্তি—'

তবে কি বিজয়কৃষ্ণের অন্তরেও এলো ভূমা-দর্শনের আকুলতা?

হাঁটছেন মেছুয়াবাজারের পথ ধরে। অকাজের কাজ করতে যাচ্ছেন। আলস্যের সহস্র সঞ্চয়ে সৃষ্টির বেদনায় বিলোল বিজয়। কি সৃষ্টি করবেন তিনি? যাঁর কোন রূপ নেই, নেই আকৃতি, তাঁর সেই অপরূপ রূপ-লাবণির বহিপ্রকাশ কি ক'রে সম্ভব? কিন্তু তবুও তিনি তন্ময়। পথে চলতে চলতে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল এক সাধুর সঙ্গে। বিজয় করলেন তাঁকে প্রণাম। দু' হাত তুলে আশীর্বাদ করলেন

সাধু। দেহ, মন ভরে গেল বিজয়ের। একটা অনির্বচনীয় আনন্দের শিহরণে রোমাঞ্চিত হলো বিজয়ের দেহগ্রন্থি। তৃপ্তির সুধা-সমুদ্রে ভাসতে ভাসতে ফিরে এলেন বাসায়। কয়েকটা দিন কাটল। উপাসনান্তে উপদেশ দিচ্ছেন গোস্বামী প্রভু—উপদেশ দিচ্ছেন ব্রাহ্ম সমাজের বেদীতে বসে। সহসা সেখানে আবির্ভূত হলেন সেই সাধু। নীরবে বসে রইলেন ঘরের এক কোণে। অবশেষে বিজয় বের হবার সময় সাধু ধরে ফেললেন তাঁর হাতখানা। থম্‌কে দাঁড়ালেন তিনি। হাসলেন একটু। জিজ্ঞেস করলেন—

'উপাসনা কেমন হলো?'

মধুর কণ্ঠে জবাব দিলেন সাধু, 'বড়ী আচ্ছা! সব তো বেদকা বাণী হ্যায়।'

কিন্তু এ-কথা তো বিজয় শুনতে চায়নি। তাঁর অন্তরাকাশে দেখতে চান তিনি চৈতন্যের পূর্ণচন্দ্রকে। কোথায় সেই হৃদ্‌বিহারী শশীস্নিগ্ধ তনুকান্তি? কে বলতে পারে তার ঠিকানা?

সাধু একটু মুচকি হেসে শুধালেন, 'তম্ গুরু কিয়া?'

বিজয় বললেন, 'আমরা গুরুবাদ মানি না।'

এতক্ষণে সব স্পষ্ট হয়ে গেল দিনের মত। হৃদয়ের বুভুক্ষার কারণটি খুঁজে পেলেন সাধু। বললেন, 'ওঃ এইছি ওয়াস্তে সব বিগড় গিয়া।'

বিজয়কৃষ্ণ চম্‌কে উঠলেন। পৃথিবীর সব আলোগুলি যেন এক এক ক'রে নিভে যেতে চাইল তাঁর চোখের 'পর থেকে। অন্ধকারের অন্তরাল থেকে একটি স্নিগ্ধ দীপশিখার মত উঁকি দিতে লাগল বারে বারে—

উঁকি দিতে লাগল সাধুর কথাটি।

তবে কি গুরু বই যাওয়া যায় না তৎপুরুষের দিঠিতে? জ্ঞান স্বরূপ ভগবান বিরাজিত সর্বভূতে। রয়েছেন তিনি আকাশে, বাতাসে,

অনলে, অনিলে। দেহেও তিনি। গেহেও তিনি। তিনিময় এই জগৎ। এত কাছের হয়েও তিনি দূরের।

কেন?

তাকে জানবার, তাকে আবিষ্কার করবার পথটি জানতে হবে। জানতে হবে কাঁদতে। সে কান্নার মন্ত্র কানে রাখবেন গুরু। দেখিয়ে দেবেন পথ। গুরু হলেন খেয়াঘাটের মাঝি। আঁধার পথের আলো।

'ধ্যান মূলং গুরুমূর্তি
পূজা মূলং গুরুপদং
মন্ত্র মূলং গুরুবাক্য
মোক্ষ মূলং গুরুকৃপা।'

বিজয়ের মনটা ডুক্‌রে কেঁদে উঠল। চাইল গুরুর কৃপা। সাধুকে শক্ত ক'রে ধরলেন বিজয়। আকুলকণ্ঠে বললেন, 'আমায় দীক্ষা দিন।'

সাধু বললেন, 'নেহি। তোমহারা গুরু দোস্‌রা হ্যায়, বখৎ হোনেসে মিল্ যায়গা। ঘাবড়াও মৎ।'

বিজয়কৃষ্ণ বের হলেন গুরুর সন্ধানে। চলল নানা পথে বিচরণ। পায়ে-চলার পথে চললেন। অতিক্রম করলেন অনেক নদী, প্রান্তর ও বন। ব্যাকুল চিত্তটা তবুও পেল না মনের মন খুঁজে। প্রেমের পারাবারের বাঁশী বেজে বেজে নীরব হয়ে যায়। অন্তর আর অন্তরতমের মাঝের ব্যবধানটুকু পূর্ণ ক'রেও যেন পূর্ণ করতে পারে না বাঁশী। মন বলে, আবার বাজাও। নবীন রাগে জীবনের বীণার সুর তোল। পথে নামো। বন মন নদী এক ক'রে নতুন ভুবন রচনা করবার সুর ধর। তিনি আসবেন। আসবেন তিনি অন্তরঙ্গতার রঙমহলে। আসবেন তিনি তোমার তপস্নিগ্ধ মনের ফাঁকটুকু পূর্ণ ক'রে দিতে।

সত্যি?

হ্যাগো, হ্যাঁ। বাঁশী আবার বাজল। অধীর হলো প্রাণ। চোখের পাড় উজিয়ে নামল জলের ধারা। ভাবের নভে পাখা মেলে চলল মন,—চলল দূরবিসারী অনন্তের অভিসারে। দেহ থেকে বিদায় নিলে ক্লান্তি। বোবা রাত্রির মত ঘুমিয়ে পড়ল শ্রান্তি। দুর্গমের বন্ধুর পথটা জুড়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রইল কতকগুলি হিংস্র জন্তু। তারা নড়ল না। এলো না ধেয়ে। প্রহরীর মত পাহারা দিল তন্দ্রাক্লিষ্ট সাধকের তনুটিকে। ঝড়-ঝঞ্ঝা অতিক্রম ক'রে বিজয় চললেন। গিরিগুহার কন্দর পেরিয়ে, বনকুসুমের ঘ্রাণ নিয়ে, বোবা রাতকে কটাক্ষ ক'রে চললেন তিনি এগিয়ে—

এগিয়ে চললেন জীবনের রাজপথ ছেড়ে গৈরিক পথের সন্ধানে।

এলেন অঘোরীর আখড়ায়। গেলেন কাপালিকের কাছে। শুনলেন বাউলের সঙ্গীত। তার পরে দরবেশ, রামাইত ও বৌদ্ধ মত ও পথের কথা আহরণ করলেন। বসেন, নয়ন মুদে ধ্যান ক'রে একবার মনের আগুন নিভিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলেন। কিন্তু আগুন তো নিভল না। দূর হলো না দহনের উত্তাপ।

আবার চলা শুরু হলো। আবার বাঁশী বাজল। এবারে বিন্ধ্যাচল পর্বতে অভিযাত্রা। সেখানে আছেন এক সাধু। চলেছেন বিজয়, চলেছেন গভীর রাত্রির মৃত্যুভয়াল পথ দিয়ে। সহসা থমকে দাঁড়ালেন। দেখলেন সামনে আট-দশজন ব্যক্তি। এদের জীবিকা চলে দস্যুবৃত্তি ক'রে। এসে দাঁড়াল তারা বিজয়কৃষ্ণের সম্মুখে। বলল, অন্যত্র চলে যেতে। বিজয় গিয়ে আশ্রয় নিলেন এক বৃক্ষমূলে। ক্ষণ বিরতি। দস্যুদের মন চঞ্চল হয়ে গেল। ভাবল তারা, নিশ্চয়ই পুলিশে খবর জানাবে। ধরিয়ে দেবে আমাদের।

তবে এখন উপায়?

ওর গলা কেটে শঙ্কা থেকে মুক্ত হওয়াই ভালো।

কিন্তু দলপতির মনটা সায় দিল না সে কথায়। বলল সে, 'ঐ ব্যক্তিকে দেখিয়াই মনে হইল যে, উনি একজন সাধু পুরুষ। উঁহার দ্বারা আমাদের কোন অনিষ্ট হইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস হয় না। অতএব, তোমরা এই সাধুহত্যারূপ মহাপাপ হইতে ক্ষান্ত হও।'

সে কথায় কান দেয় না ওরা। মত্ত জন্তুর মত আসে এগিয়ে। এগিয়ে আসে বিজয়কে হত্যা করতে। কিন্তু সম্মুখে এসেই চমকে ওঠে তারা। দেখতে পায় এক প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র প্রহরীর মত বিজয়ের দেহকে রক্ষা করছে। ভীতত্রস্ত দস্যুদল ফিরে এলো। বলল দলপতির কাছে এ অলৌকিক কাহিনী। শ্রদ্ধায় সম্ভ্রমে ভক্তির জোয়ার এলো দলপতির অন্তরে। তার দস্যুবৃত্তির চিন্তা এলো মন্থর হয়ে। কিন্তু তবুও মুক্তি পেল না তারা। রাত্রে প্রবল ঝড় উঠল। উড়িয়ে নিয়ে গেল ভগ্ন দালানের ছাদ। মৃত্যুমুখে পতিত হলো সকলেই এক রকম। থাকল শুধু দলপতি।

প্রভাতের অরুণ-লেখায় মুছে গিয়েছে ঝড়ের কালিমা। বিজয় আশ্রয় নিয়েছেন বিন্ধ্যবাসিনীর বাড়ীতে। অতিথি হলেন তার। হাজির হলো এসে দস্যুর দলপতি। চিনল বিজয়কে। বিনীত প্রার্থনা নিবেদন করল সে। চাইল ক্ষমা।

বিজয় তো অবাক্।

কেন ?

এ ঘটনার কিছুই জানেন না তিনি।

সব কথা খুলে বলল দস্যু-দলপতি। ক্ষমা করলেন বিজয়কৃষ্ণ।

মুছে গেল তার মন থেকে প্রবৃত্তির কুৎসিততম ভাবনা। কৃতকর্মের জন্যে চোখের জলে বুকের ব্যথায় ভেসে গেল দস্যু। প্রাণটা উঠল কেঁদে।

বাঙলার মৃৎকোষে প্রণীত হয়ে রয়েছে প্রেমের ফল্গু। তাকে বের করতে হয় মাটি খুঁড়ে। শ্রান্ত জীবনের ক্লান্তিতে ক্ষয়ে না পড়ে বসতে

হবে নয়ন মুদে। রাত্রির বৃন্তে ফুটে থাকতে হবে প্রসূনের মত। রূপান্তরিত করতে হবে অন্তরের অতসীকুঞ্জকে রজনীগন্ধার ঝাড়ে। তবেই তাপিত হৃদয় ছোঁয়া পাবে প্রশান্তির। নয়নে ভেসে উঠবে মনোময়ের তনুকান্তি।

বিজয়কৃষ্ণ তাঁর অন্তরের দীপ জ্বেলে এবারে যাত্রা করলেন ব্রহ্ম-বিজ্ঞানের সন্ধানে। পেরিয়ে এলেন তিব্বতের গুহাগহ্বর। ফেলে এলেন বনকান্তার। উপস্থিত হলেন এসে গয়াধামে। জীবনের সব-চেয়ে যিনি নিকটতম, তাঁকে যে খুজে বের করতেই হবে। দেহ-সুখকে বিতাড়িত করলেন। আত্মনিগ্রহের অনল জ্বালিয়ে দুঃখকে পাঠালেন আহ্বান-লিপি।

না হয় বুকে দহন দিও
সে-ও আমার ভালোর ভালো
তবুও তোমার দরশ পাব
সেই তো হবে পরম পাওয়া।

এই পরম পাওয়ার আনন্দে চরম হয়ে উঠলেন বিজয়কৃষ্ণ। প্রেমের প্রবাহে ভেসে চলল তাঁর দেহতরী। দীনতার অন্ধকার অপসৃত হলো। জ্বলে উঠল সত্যের দীপাবলী। সন্ধ্যার গুণ্ঠন নেই। মায়ার ছায়া নেই। নেই প্রিয়ার পর প্রাপ্তির আকুলতা। বিজয় বিবেকের কান্নায় কাতর হয়ে গিয়েছেন। আর তিনি কলকাতায় ফিরবেন না। তাঁর জীবনের জ্বালা যদি না নির্বাপিত হলো, তবে কেন, কিসের জন্যে ফিরে যাবে ঘরে ?

সংসারের দুঃখ, কষ্ট, মৃত্যু ও কান্না এর মাঝে থেকে কি হবে ?

ওগো, তুমি আমার অন্তরের কান্নায় সাড়া দাও। চলে এসো অন্তরঙ্গতার রঙমহলে। তুমি আর আমি বসব দু'জনে মুখোমুখি।

কইব প্রাণের কথা। প্রাণের কথা প্রাণের দোসর বই তো কাউকে বলা চলে না। আমার সকল অহংকার চূর্ণবিচূর্ণ কর। ভেঙ্গে দাও হৃদয়ের সচেতন স্পর্ধা। তোমাকে পাবার গর্বে গর্বিত কর। তোমাকে দেখবার আকুলতায় মুখর কর। তোমার অঙ্গে মিলিয়ে সবার জন্যে আমাকে দ্রবীভূত কর। অঙ্গে অঙ্গ মিলে যাক। বাক্যে বাক্য। বেজে উঠুক ঐক্যের মিলনমন্ত্র।

গুরু মিলে গেল বিজয়কৃষ্ণের—

গুরু মিলে গেল আকাশগঙ্গা পাহাড়ে। স্পর্শাতীতের স্পর্শ পেয়ে হর্ষানন্দে বিজয়কৃষ্ণ মৌন হয়ে বসলেন ধ্যানে। ব্রহ্মানন্দ পরমহংসের কৃপাধন্য বিজয় এবারে প্রেমের পথে প্রেমের পাগল হয়ে প্রেমিকের সন্ধানে অন্তরঙ্গ হয়ে উঠলেন।

মানব-প্রেমিক বিবেকানন্দ

আজিকার এ খণ্ড স্বার্থের যুগে অখণ্ড সৌন্দর্যের পূজারী স্বামী বিবেকানন্দের বন্দনা-গান একান্ত আবশ্যক।

দিকে দিকে লোভ-লোলুপ জাতি স্বার্থের সংঘাতে মত্ত। কোথায় তাদের মনুষ্যত্ব—আর কোথায় বা ব্রহ্মবোধের উপলব্ধি? কেবল কতকগুলো ফাঁকা কথার মালা গেঁথে চলেছে তারা, চলেছে দিনের পর দিন ভোগবাদের চরম শিখরে। ত্যাগ নেই। তিতিক্ষা নেই। নেই বিন্দু সাধনা তাদের জীবনে। হাল্কা স্বদেশপ্রেম আর কতগুলো হাল্কা কথা দিয়ে আজিকার দিগ্‌ভ্রান্ত সমাজটাকে ফেলতে চাইছে তারা আচ্ছন্ন ক'রে। বলি—অর্থনৈতিক কচকচিতে মানুষের মুক্তি আর সাম্য কি আসবে? গৃহে গৃহে টগ্‌বগ্‌ করছে বাসনার কটাহ। আর তারই বিভিন্ন প্রকাশ জীবনযাত্রার উচ্চমানের ধুয়োর মাধ্যমে। কিন্তু তবুও তো কোন দেশে শান্তি নেই, তৃপ্তি নেই, নেই সমাহিত ভাব। কেবল বাসনাবিক্ষুব্ধ মন চলেছে মানুষের সমাধির ওপর ঐশ্বর্যের মিনার তৈরী ক'রে। ক্ষুদ্রের ভেতরে বৃহৎকে দেখতে তারা জানে না। খণ্ডের ভেতরে পায় না খুঁজে অখণ্ডের আভাস। কেমন ক'রে তা পাবে? এ শক্তি অর্জন করতে হলে চাই যে ভাগবত অনুভূতি। সে দৃষ্টি, সে ভাব, সে সাধনা তো তাদের নেই! মনুষ্য জীবনের সার্থকতা কিসে? স্বার্থের গুণনে, অহংকারের অভ্রভেদী

চূড়ারোহণে, হৃদয়ের ব্ল্যাকমার্কেটিং-এর পথে নয়—মানুষের স্বার্থকতা মনুষ্যত্বের উদ্বোধনে—ব্রহ্মবোধে।

আমার উপলব্ধিতে স্বামিজী যে ভাবে আভাসিত হয়েছেন, তারই দু-একটি কথা আজ বলব।

স্বামিজীর কথা বলতে গিয়ে সবপ্রথমেই আমার মনে হচ্ছে যে, যারা আনল বাসনার বিক্ষুব্ধ সমুদ্রে করুণার বারিবন্যা, জ্বেলে দিল যারা হৃদয়ের বিষণ্ণ গোধূলিতে আশার দীপশিখা, যারা দিল বুকে ক'রে ঐহিকের সঙ্গে ভাগবত দ্যোতনা—আর যারা আনল মর্তের মরু-সাহারার বুভুক্ষার আকাশগঙ্গার বিগলিত ধারা—স্বামী বিবেকানন্দ তাদের অগ্রণী।

সন্ন্যাসী ছিলেন তিনি। সন্ন্যাস ধর্ম ছিল তাঁরও। কিন্তু সে কেমন সন্ন্যাস?

যাই দেখি একটু তাঁর জীবনগ্রন্থের পাতাগুলো উলটে।

প্রতিপালিত হয়েছিলেন সুখের ঘরে শৈশবে। মা ভুবনেশ্বরীর তপোলব্ধ ধন। বিশ্বনাথকে মানত ক'রে লাভ করেছিলেন তাঁর বহু আকাঙ্ক্ষিত 'বিলেকে'। বাপ বিশ্বনাথ দত্ত সর্বঢালা স্নেহ দিয়ে গড়েছিলেন তাঁর নরেনকে। বেশ সুখেই কাটছিল দিনগুলো। ভাগ্যের বিড়ম্বনা। বাপ মরলে পর অভাবের তাণ্ডবে সারাটা সংসার গেল তচ্‌নচ্‌ হয়ে। ভেঙ্গে পড়ল ঐশ্বর্যের মঠ-মিনারগুলো। দেখা দিল হাহাকার। দুঃখদৈন্যের চাপে কাটতে লাগল দিন। রাতের পর রাত কেটে যেতে থাকল অনাহারের দহন-জ্বালায়। চাকুরীর সন্ধানে বের হলো নরেন।

হানা দিলে অফিস থেকে অফিসে। কিন্তু ভাগ্যে ব্যর্থতার গ্লানি বৈ জুটল না কিছু। যাদের গতিবিধি ছিল দত্ত-ঘরের অন্দরমহল অবধি বিশ্বনাথের সু-দিনে, তারা দূর থেকেও দেখে যায় না একটি

বার অভাবগ্রস্ত সংসারটাকে। উপরন্তু সুযোগ বুঝে আত্মীয়-স্বজনরা জুড়ে দিল মামলা।

এমন দিনে একদিন দেখা হয়ে গেল শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সঙ্গে। কিন্তু নিরাকারবাদী মানতে চাইল না সাকার সাধকের জারিজুরি। তারপরে আবার অমন একটা অশিক্ষিত বামুন। মোটে আমলই দিলে না নরেন্দ্রনাথ তাঁকে। বললে, এত পড়াশুনো করে পেলাম না যার হদিস, কোথাকার একটা অশিক্ষিত বামুন করে ফেললে তার কিনারা? যত সব বাজে কথা।

কিন্তু ঠাকুর তো নরেনকে দেখেই আকুল কণ্ঠে বললেন—"ওরে তুই এতদিন কোথায় ছিলি?"

দক্ষিণেশ্বরের গঙ্গার কূলে দাঁড়িয়ে কেঁদে আকুল নরেনের জন্য। "ওরে তুই আয়। তোকে না হ'লে যে আমার সব কাজ যাবে ব্যর্থ হয়ে।"

দেহ পড়ে থাকে। মন যায় অভিসারে। যায় সেই ছায়া-মেদুর বীথিবনে—দক্ষিণেশ্বরে—ঠাকুরের পদপ্রচ্ছায়ে।

অবশেষে এলো একদিন—এলো নরেনের জীবনে শুভমুহূর্ত। ঠাকুরের কৃপাঘন করুণায় মৃন্ময়ী মূর্তির সম্মুখে দাঁড়িয়ে নরেন দেখল চিন্ময়ী তনু। অবাকবিস্ময়ে গেল তন্ময় হয়ে। চাইতে গিয়েছিল দুঃখ-দৈন্য, অভাব-অনটনের প্রতিকার। কিন্তু কি নিয়ে এলো?

নিয়ে এলো এক অনির্বচনীয় আনন্দ। অবাচ্য অনুভূতি। বলতে গিয়েছিল মা আমায় সুখ দে, স্বাচ্ছন্দ্য দে, দে না আমার অভাবের সংসারটায় স্ব-ভাব ফিরিয়ে। কিন্তু চাইল শুধু জ্ঞান-ভক্তি-প্রজ্ঞা ও প্রেম। আর চাইল মুক্তি, বৈরাগ্য ও সাধন।

কি আর চাইবে?

সব চাওয়া ও কামনার শতদলে দেখল মায়েরই পাদপদ্ম। ভুলে গেল সব। তন্ময় হয়ে গেল সেই পদ্ম-প্রভায়। লাভ করল ঠাকুরের

কৃপা। নিরাকার উপাসক লুটিয়ে পড়ল সাকার সাধকের চরণ-তলে। বলল—"আমায় মার গান শিখিয়ে দিন। শিখিয়ে দিন নির্বিকল্প সাধনার মন্ত্রটি।"

গান শিখিয়ে দিলেন ঠাকুর—"মা ত্বংহি তারা

ত্রিগুণ ধারা পরাৎ পরা।"

কিন্তু নির্বিকল্প সাধনার কথা তো বলছেন না।

নরেনও ঠায় দাঁড়িয়ে। চোখে তার যোগীর দৃষ্টি। দেহে শঙ্করের তনু-শোভা। ললাটে বুদ্ধদেবের বিজয়-টিকা।

অপলক নেত্রে প্রত্যক্ষ করছেন শ্রীরামকৃষ্ণ।

অবশেষে বললেন -"নরেন তুই কি চাস ?"

চাই—"শুকদেবের মত সর্বদা নির্বিকল্প সমাধি-যোগে সচ্চিদানন্দ সাগরে ডুবে থাকতে।"

চোখ যায় রাঙ্গা হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের। মেজাজ করে ওঠেন নরেনকে,—"বার বার ঐ কথা বলতে তোর লজ্জা করে না! কোথায় কালে বটগাছের মত বর্দ্ধিত হয়ে শত শত লোককে শান্তি ছায়া দিবি, তা না তুই নিজের মুক্তির জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিস। এত ক্ষুদ্র তোর আদর্শ!"

এত বড় স্বার্থপর তুই। ওরে, নিজের মুক্তি কামনা, সেও তো কামনা। আর তুই নিজেকে নিয়েই মগ্ন হয়ে যাবি ? না না। তা হবে না।

মানুষের দুঃখ, মানুষের কান্নার সঙ্গে পরিচিত হয়ে যা। তাদের কান্নার অশ্রু মুছিয়ে দে তোর সান্ত্বনার অভয় অঞ্চলে। আত্মীয়তা স্থাপন কর তাদের দুঃখ-বেদনার সঙ্গে। যারা মানুষ হয়ে এসেও মানুষের অধিকার থেকে হলো বঞ্চিত, যাদের চোখের জলের, বুকের ব্যথার খবর কেউ নিলে না, তুই তাদের মাঝে বিলিয়ে দে আপনাকে। তাদের বাতায়নের দুয়ার থেকে সরিয়ে দে বিষাদের আগল। কণ্টক মুক্ত কর তাদের মুক্তির পথকে।

সহসা এক ঝলক খ্যাপা ঢেউ যেন এসে আছড়ে পড়ল স্বামিজীর অন্তরে। চকিতে তাঁর চোখ নেমে এলো বাস্তবতার ধূলিধূসরিত পথে। নেমে এলো নরেন তপের আসন থেকে রূঢ় রিক্ত ময়দানে।

কি দেখল সেখানে ?

দেখল, অবজ্ঞাত জাতি। অনাহারে, লাঞ্ছনায় অবলুণ্ঠিত মাতৃমূর্তি। আত্মবিস্মৃতির পথে জাতির যাত্রা অব্যাহত। অন্তরালে দাড়িয়ে ঠাকুর মার কাছে জানান প্রার্থনা—"মা, নরেন্দ্রের অদ্বৈত অনুভূতি তোর মায়াশক্তি দিয়ে অবরণ করে রাখ মা ; আমার ওকে দিয়ে অনেক কাজ করিয়ে নিতে হবে।"

এই অনেক কাজের মধ্যে ঠাকুর নামিয়ে দিলেন নরেনকে। নামিয়ে দিলেন লক্ষ কোটি জনতার মাঝখানে তাদের মর্মদীর্ণ হাহাকারের মধ্যে : হাল ধরল নাবিক। পাল উড়িয়ে দিল আকাশে।

অনেকগুলো দিন কেটে গেল। অনেক উত্থান-পতন ও অনেক বন্ধুর পথ অতিক্রম করে এলেন স্বামিজী কাশীতে। ঠাকুর নেই আর ইহলোকে। সতীর্থরাও চলে গেছেন অনেকেই। মন করে খাঁ খাঁ মরুর মত। দিগভ্রান্ত পাখীর মত এখান থেকে সেখানে, সেখান থেকে ওখানে—এই ক'রে ক'রেই কাটছিল দিনগুলো। সহসা মনের ক্রান্তিবৃত্তে ছায়ার মত সঞ্চারিত হলো হিমালয়ের হিমতুহিন মূর্তি। যেন শুনলেন গিরি গুরুর আহ্বান। পাগল হয়ে গেল মন। যাত্রা করলেন। বলে গেলেন প্রেমদাস বাবুকে—"যখন আমি ফিরে আসব, তখন সমাজের ওপর বোমার মত ফেটে পড়ব এবং সমাজ হবে আমার অনুবর্তী।"

এই বোমার মত ফেটে পড়ার সাধনাই হলো স্বামিজীর সাধনা। তাঁর অন্তরে মূর্তিমান হয়ে উঠল মানুষের সত্য ধর্ম। তাদেরই জীবন-দর্শন।

তারপরে একদিন রিক্ত নিরালম্ব সন্ন্যাসী বেরিয়ে পড়লেন—বেরিয়ে পড়লেন বিশাল ভারতের অন্তহীন পায়ে-চলার পথে।

হিমশীতল হিমগিরির গভীর গুহায়, মরুময় দিগন্তের উষরতায়, তপ-স্নিগ্ধ তাপসের তীর্থে তীর্থে কেটে গেল দীর্ঘ পাঁচটি বছর। অর্জন করলেন বিচিত্র অভিজ্ঞতা। বদ্রিকাশ্রম থেকে রামেশ্বর, বঙ্গদেশ থেকে দ্বারকার পথ অতিক্রম করলেন হেঁটে হেঁটে স্বামিজী। ধনীর প্রাসাদ থেকে দীনের পর্ণকুটীরে, ভিক্ষুকের আখড়া থেকে বৃক্ষতলের অনাথা অবধি হলো তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। কি দেখলেন তিনি?

দেখলেন প্রকৃত ভারতবর্ষকে। কোথায়? পড়ে আছে দরিদ্রের জীর্ণ কুটীরে। অবহেলার আঁস্তাকুড়ে। উপেক্ষার অন্ধকারে। আচ্ছন্ন দেশ কুসংস্কারের তমসায়। নেমে যাচ্ছে দেশ দিন দিন অধোগতির অথৈ অতলান্তে। চোখ ফেটে কান্না এলো। তপ্ত অশ্রুতে তর্পণ করলেন দুঃখ-নিশার। বক্ষ ভেসে গেল কান্নার জলে।

কিন্তু মন আবার সহসা মধ্যাহ্নের সূর্যের মত জ্বলে ওঠে মুহূর্তে। স্থির হয়ে-যায় সঙ্কল্প।

মাতৃভূমির দুঃখ স্খালনে করবেন আত্মোৎসর্গ। জীবন পাত করবেন অকাতরে। শত সহস্র বিঘ্নের উপল সরিয়ে ফেলবেন জাগরণের অভী আহ্বানে। মনে পড়ে যায় শ্রীগুরুর কথা—"নরেন সকলের নেতা। নরেন্দ্র। নরোত্তম।"

হে প্রভু, আমায় প্রচার করতে দাও সার্বভৌম বেদান্তের বাণী। হৃতসর্বস্ব মাতৃভূমির লুপ্ত গৌরবকে দাও উদ্ধার করতে। দুঃখিনী জন্মভূমির চোখের জল মোছাতে দাও সার্থক সন্তানের মত। তোমার আশিস চাই। চাই তোমার আশীর্বাদ। আমার বাহুতে বল দাও। হৃদয়ে দাও শক্তি। দাও হে প্রভু, আমাকে তোমার করুণারূপ আশিস স্পর্শ।

সহসা দেখলেন স্বামিজী, দেখলেন শ্রীরামকৃষ্ণের ছায়া-মূর্তি। দেখলেন তরঙ্গায়িত সমুদ্রের ফেনিল উচ্ছ্বাসের মধ্যে। যেন হাত ছানি দিয়ে আহ্বান করছেন—আয়, আয়, আয়! চলে আয় পৃথিবীর কেন্দ্র-বিন্দুতে। প্রচার কর মহাভারতের সাধনার ঐক্য, বেদান্তের সার্বভৌম বাণী। বিনিময় নিয়ে আয় অর্থ, বৈজ্ঞানিক কৌশল। আর নিয়ে আয় সংগঠনের শক্তি। তারপরে লেগে যা দেশের কাজে। দশের হিতে।

আশ্বস্ত হলো স্বামিজীর মন। স্থির সিদ্ধান্তে হলেন উপনীত।

তারপর যাত্রা করলেন মদগর্বিত ভোগবাদের লীলাভূমি পাশ্চাত্যের মাটিতে। প্রচার করলেন বেদান্তের বাণী। জগতের তোরণ-তীর্থে উড়িয়ে দিলেন ভারতবর্ষের গৈরিক পতাকা। সুপ্রতিষ্ঠিত হলো ভারত জগতের শীর্ষাসনে। পরিচিত হোলেন স্বামিজী সুইজারল্যাণ্ড, জার্মান, নেপল্‌স্‌, আমেরিকা, ইংলণ্ড, চীন, জাপান ও পরোক্ষভাবে রুশদেশের সঙ্গেও। কেবল পরিচিত নয় শুধু—অর্জন করলেন ত্যাগের আসনে সম্রাটের সম্মান।

কলিঙ্গ যুদ্ধের পর সম্রাট অশোক জগৎ-বিজয়ে বেরিয়েছিলেন ভগবান বুদ্ধের প্রেম ও মৈত্রীর বাণী লয়ে। বিশ্ব বিজয় করলেন ত্যাগের জয়গান গেয়ে। সে দিনগুলো ইতিহাসের পাতায় উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। কিন্তু আজ আমরা প্রত্যক্ষ করলাম শ্রীরামকৃষ্ণ সাধনার মূর্তবিগ্রহ স্বামিজীকে যিনি সর্বধর্ম সমন্বয় সাধক পরমপুরুষের বাণী বহন ক'রে জয়ের মুকুট পরিয়ে দিলেন ভারত-জননীর মস্তকে।

স্বামিজীরই উত্তর সাধকরূপে তারপরে আমরা প্রত্যক্ষ করলাম রবীন্দ্রনাথ, অরবিন্দ, মহাত্মা গান্ধী, জহরলাল ও সুভাষচন্দ্রকে।

যা বলতেছিলাম। যাত্রা করলেন স্বামিজী স্বদেশের দিকে। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের শেষ দিক। ৩০শে ডিসেম্বর ছাড়ল জাহাজ, ভোগের তট থেকে ত্যাগের তীর্থ অভিমুখে—ভারতবর্ষে। বিরামহীন গতি।

চলেছে জাহাজ একটানা অবিরাম। তরঙ্গ বন্দনা করে চলেছে। অভ্রস্পর্শী দিগন্তরেখা। শুভ্র সফেন ঢেউ। নেই কোন বাধা। অবারিত। উন্মুক্ত। দিগন্তশায়ী। চলেছে জাহাজ সীমায়িত ভোগের জমক থেকে অসীমে। এগিয়ে যাচ্ছে ত্যাগের তপতীর্থে। ভারতবর্ষে। এ যেন এক মহামগ্নতার অভিসার। চলেছে জাহাজ কৃত্রিমতার ক্ষণ-সুখ থেকে কৃতযুগের পণ্য কুড়াতে। কুজ্ঝটিকার নির্শিনির্ঝর থেকে আলোর দ্যুতি বিচ্ছুরণে। মনে পড়ে সেই—কোকিল কুহুরব! সমুচ্ছ্বসিত কুহুরণ! বৃন্দাবন! তার বনরাজিনালা।

তারপর? হিমগিরি হিমালয়। তার ধ্যানগম্ভীর মূর্তি। সমুদ্র সৈকত। দিগন্তবিসারী সর্বঢালা করুণারুণ প্রশান্ত ভালোবাসা। নীল আকাশ। তার কোল জুড়ে কপোতকূজন। পূর্বরাগের মধুময় আর্তি। বিরহ, আকুলি-বিকুলি। অগণিত জনতার মিলিত মিছিল। সেই ভারতবর্ষের তটতীর্থে চলেছে জাহাজ উজান ঠেলে, বায়ুর বাঁক কাটিয়ে। বসে ভাবছেন—জাহাজে বসে ভাবছেন স্বামিজী—কি পেলাম—দিয়ে বা এলাম কি? তার হিসাব মেলাতে মন মগ্ন।

দেখ, ভাল করে দেখ। পেয়েছ কি তোমার আরব্ধ কর্মের পুরস্কার? চলেছ তোমার শৈশবের ক্রীড়াকুঞ্জে। চলেছ যৌবনের স্বপ্ন-উপবনে, জীবনের উপান্ত দিনের বারাণসী ভারতবর্ষে।

কিন্তু কি নিয়ে যাচ্ছ তার জন্যে?

সহসা ডুবে যান বিবেকানন্দ চিন্তার গভীরে। এক এক করে এসে পাশ্চাত্ত্যের ক্ষুদ্র-বৃহৎ ঘটনাগুলো উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

স্বামিজী দেখলেন,—"সংসার-সমুদ্রের সর্বজয়ী বৈশ্য শক্তির অভ্যুত্থানরূপ মহাতরঙ্গের শীর্ষস্থ শুভ্র ফেনরাশির মধ্যে ইংলণ্ডের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত।......"

আর? "ঈশামসি বাইবেল, রাজপ্রাসাদ, চতুরঙ্গিণীবলের ভূকম্পকারী পদক্ষেপ, তুরী ভেরী নিনাদ রাজসিংহাসনের বহু আড়ম্বর, এ সকলের পশ্চাতে বাস্তব ইংলণ্ড বিদ্যমান। যে ইংলণ্ডের ধ্বজা কালের চিমনিবাহিনী পণ্যপোত, যুদ্ধক্ষেত্র জগতের পণ্যবীথিকা এবং সাম্রাজ্ঞী স্বয়ং সুবর্ণাঙ্গী শ্রী।" দেখলেন তিনি আরো। এই বণিক-শাসনের বনিয়াদের ভিতকে আন্দোলিত করে এগিয়ে আসছে লাখ-কোটি শ্রমিক। আসছে তাদের পবিত্রতম অধিকার জানাতে। পেষণের শাসন দুর্গ ভেঙ্গে চুরমার করতে। আকাশে ওড়াতে তাদের শোণিতসিক্ত পতাকা। স্বামিজীর ভাষায়—"প্রকৃতির চক্ষে ধূলি দিবার শক্তি কাহার? সমাজের চক্ষে অনেক দিন ধূলি দেওয়া চলে না।····· সর্বংসহা ধারত্রীর ন্যায় সমাজ অনেক সহেন, কিন্তু একদিন না একদিন জাগিয়া ওঠেন এবং সেই উদ্বোধনের বেগে যুগ যুগান্তের সঞ্চিত মলিনতা ও স্বার্থপরতারাশি ধৌত হইয়া যায়।"

সে দিন আগত। "য়ুরোপ এক আগ্নেয়গিরির পার্শ্বে রহিয়াছে; যদি এক আধ্যাত্মিক প্রবাহে এই আগুন না নিভে, তাহা হইলে ইহা ফাটিয়া পড়িবে।" চাই ধর্মের প্রবল প্রবাহ। মানুষের মন নির্মম, পবিত্র শুদ্ধ না হোলে তো শুভ শক্তির উদ্বোধন হবে না! হবে না তার লালসা-লোলুপ মন ত্যাগের তপে শুদ্ধ! আর যদি তা না হয়, তবে সংগ্রাম নিশ্চিত। রক্তক্ষরা সংগ্রাম। অগণিত মানুষের প্রাণ বলি হবে। সেই রুধিরসমুদ্রের তরঙ্গে অত্যাচারীর স্বদম্ভ আস্ফালন কালের কক্ষে যাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে। সে দিনগুলো আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। সেই থেকে জগতের বুকে কায়েম হবে সুস্থ সুন্দর মানুষের রাজত্ব। ভেদ ভুলে যাবে আত্মগর্বী দাম্ভিকের দল। মানুষের মধ্যে প্রত্যক্ষ করবে নারায়ণ। আর মানুষের সেবায়, মানুষের চাহিদা ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে নিয়োজিত হবে রাজশক্তি। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য

দুনিয়ায় তা নীতিবোধের জাগরণে সম্ভব নয়। সেখানে সংগ্রামী জনতার মিলিত মিছিল অবশ্যম্ভাবী। আর তা—"রাশিয়া হইতে, অথবা চীন হইতে আসিবে……।"

"জগতে এখন বৈশ্যাধিকারের (বণিক) তৃতীয় যুগ চলিতেছে। চতুর্থ যুগে শূদ্রাধিকার (প্রোলেটরিয়েট) প্রতিষ্ঠিত হইবে।" ক্ষত্রিয়ের স্বেচ্ছাচারী শাসন লুপ্ত হয়ে দেখা দেবে বৈশ্য-শাসন। কিন্তু তাদের লোলুপ রসনার নিঃশব্দ পেষণে সর্বহারা জনতার মনে জেগে উঠবে একটা প্রবল ঝড়। সেই ঝড়ের ক্ষুব্ধ সমুদ্রে জগতের সমস্ত মেহনতি জনতা এসে ঝাঁপিয়ে পড়বে। দুনিয়ার মজদুর এসে দাঁড়াবে এক পতাকা-তলে। এক সঙ্গে তারা বলে উঠবে, দুনিয়ার মজদুর এক হো! এক হো!

শ্রমিক-অধিকার হবে প্রতিষ্ঠিত। সর্বহারা জনতার অপূর্ব সাফল্যে জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে ন্যায়, নীতি ও ধর্ম। বৈশ্য-শাসনের বনিয়াদ উঠবে টলমল করে। লুপ্ত হয়ে যাবে মৃত্তিকাগর্ভে তাদের স্বর্ণসিংহাসন। যুগ-যুগান্তে হয়তো কোন প্রত্নতাত্ত্বিক করবে তা আবিষ্কার। রাখবে কোন যাদুঘরে।

ঘনায়মান দুর্যোগের দিনে সমুদ্র তার বুকের পাঁজর জ্বেলে এগিয়ে আসবে দুঃখনিশার শেষ উষায় প্রভাতের স্তুতি পাঠ করতে। জগৎ হবে ফুলের মত বিকশিত। ফুটবে সকলের মুখে হাসি। আনন্দে আবেগে নয়া মানুষের অন্তর উঠবে সৃষ্টির সাধনে জাগ্রত হয়ে। কর্মযোগের প্রসারতা হবে।

বললেন স্বামিজী—"ইহার সুবিধা এই, বাহ্য সম্পদে ও দৈহিক সুখ-সুবিধা সমাজের সর্বস্তরে বিতরিত হইবে,……সাধারণ শিক্ষার প্রসার ঘটিবে………"

সত্যদ্রষ্টা ঋষির অন্তরে আভাসিত হোল আগামী পৃথিবীর ছবি।

এইখানে প্রভেদ স্বামিজী ও মার্ক্সে। এই যে অনুভূতি, এই যে সত্য দর্শন—তা সম্ভব হয় কেবল ভাগবত অনুভূতি থাকলেই। যেটা মার্ক্সের ভেতরে আমরা পাইনি।

আমাদের উপনিষদ কি বলেছে?

উপনিষদ বস্তুজগতের অবজ্ঞা করে ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার পথে যায়নি। সে বলেছে 'অন্নং ন নিন্দ্যাৎ'। অন্নকে করো না উপেক্ষা। অতিথিদের জন্যই অন্ন। জীবের সেবায়ও চাই অন্ন। সেবার শক্তি যে নিহিত রয়েছে অন্নে।

বস্তুবাদীরা এই শুনেই ক্ষান্ত। আর গেলেন না তারা এগিয়ে। কিন্তু উপনিষদ তো কেবল এই খণ্ড জীবনের কথা বলেই ক্ষান্ত হয়নি। অন্নময় সত্তা—সে তো খণ্ড সত্তা। এর চেয়েও যে রয়েছে আরো গোপন সত্তা মানুষের জীবনে। অন্ন দরকার। প্রয়োজন। এটাই চরম ও পরমা নয়। এই বস্তু ও খণ্ড স্বার্থ থেকেই জাগ্রত হয় লোভ ও লালসা।

তবে উপায়? উপায় হোল বস্তু-সত্তার সঙ্গে যুক্ত করে দাও ভাগবত-সত্তা। তবেই রইবে বস্তু প্রয়োজনের দাস হয়ে। বস্তু আর মানুষকে তার দাসানুদাস ভৃত্য করে লোভ-লোলুপ করে তুলতে পারবে না। বস্তুর বাসনা থেকে মানুষ তখন মনোদাক্ষার আনন্দে উঠবে নৃত্য করে। সার্থক হবে জীবন ও জগৎ।

স্বামিজীর সাধনা এই উপনিষদের সাধনা।

স্বাজাত আবার তিনি,—"যদি এমন একটি রাষ্ট্রগঠন সম্ভবপর হয়, যেখানে পৌরোহিত্য যুগের জ্ঞান, সামন্ত যুগের সংস্কৃতি, বণিক যুগের বণ্টনের আদর্শ এবং শ্রমিক যুগের সাম্যের আদর্শ অব্যাহত থাকিবে, অথচ তাহাদের দোষগুলি থাকিবে না, তাহাই হইবে আদর্শ রাষ্ট্র। কিন্তু ইহা কি সম্ভব?"

বলতে বলতে বিদ্রোহীর আত্মায় আগুন ধরে গেল। বললেন,—"আমি নিজে একজন সোশ্যালিষ্ট,—এই ব্যবস্থা, সর্বাঙ্গসুন্দর বলিয়া নহে, কিন্তু পুরা রুটি না পাওয়া অপেক্ষা অর্ধেক রুটি ভাল।"

আবার ভাবছেন স্বামিজী, সত্যি কি নিয়ে যাচ্ছি স্বদেশে আমার! চলছে যোগ, বিয়োগ। গুণ, ভাগ। ফল দাঁড়াল কি?

একদিকে প্রাপ্তি। আর-এক দিকে ব্যর্থতা।

ভারতবর্ষের আর্তপীড়িত ভাইদের জন্য গিয়েছিলেন স্বামিজী দুমুঠো দয়ার দান চাইতে।

—কিন্তু পাশ্চাত্ত্য কি তা দিয়েছে?

না।

সে দিক থেকে তার যাত্রা হয়েছে ব্যর্থ। দেয়নি তারা স্বামিজীকে ঐশ্বর্যের আর মুদ্রার ঝাঁপি তুলে হাতে। রিক্ত সন্ন্যাসী রিক্তের বেদনা নিয়েই ফিরছেন আবার।

তবে কি পেল?

পেল ক্ষমতার প্রভুত্ব। কর্তৃত্বাধিকার।

এতো কম সম্পদ নয়। ভারতবর্ষের লাঞ্ছিত জনতাকে দাঁড়াতে হবে তার নিজের পায়। আহরণ করতে হবে জীবনের উপচার, বাঁচার অধিকার।

ওরে, পরের দেয়া ধনে আর কদিনের আহার জোটে? পরের কৃপা-করুণায় কি আর জীবনের গতিছন্দে থাকে—স্বাচ্ছন্দ্য? যেমন ভাঁটার টানে নদী মন্থর; তেমন দয়ার দানে জীবন শ্লথ।

কোথায় পাবে মন মুক্ত দিগন্তের পরিধি। আর যদি তা না পেলো, তবে আনন্দের অভিব্যক্তি নেই তো! নেই তো জীবনের প্রস্ফুটন! বিকাশ! আর প্রকাশ!

তাই আবার বজ্রদৃঢ় কণ্ঠে বললেন স্বামিজী,—"আমি এমন এক ধর্ম প্রচার করিতে চাই, যাহাতে মানুষ তৈরী হয়।" আর সেই

যাত্রার মহালগ্নে হে বীর বিদ্রোহী! তুমি এসো, এসো মিছিলের প্রথম যাত্রী, তোমরা মৃত্যুলাঞ্ছিত জীবনের দুর্জয় সত্য ঘোষণা কর আকাশে, বাতাসে মানুষের মর্মদুয়ারে।

সত্যি তাই হোল! নেমে এলেন স্বামিজী। বললেন,—"বিশ্রাম চাহি না। কাজ করিতে করিতে মরিব। জীবন একটা যুদ্ধ। আমাকে যুদ্ধ করিয়া বাঁচিতে ও মরিতে দাও।"

হে মহাশক্তি! তুমি জাগ্রত হও আমার আত্মার আকাশে। আমার চলার পথে তুমি সূর্যের মত কর কিরণ-সম্পাত। অন্তরে ফুটে ওঠে অজস্র কর্মের কলি। তরঙ্গ-স্পন্দনের মত মনের সমুদ্রে জাগে প্রবল আশার তুফান। মন ভরে গেল মুহূর্তে।

এগিয়ে চলল জাহাজ। কেটে গেল ষোল-সতের দিন। এসে পৌছল জাহাজ ভারতবর্ষের প্রান্ত সীমায়।

১ই জানুয়ারী। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দ।

অপগত হয়েছে রাত্রির অন্ধকার। আকাশের পূর্বভালে উদিত হয়েছে সূর্য। কলম্বো বন্দর। ডেকের ওপর দাঁড়িয়ে বিবেকানন্দ। তাকালেন একটি বার দূর দিগন্তের দিকে। মুদিত হয়ে গেল আবেগে অনুরাগে স্বামিজীর চোখ।

শ্রদ্ধাসম্মত চিত্তে জানালেন প্রণাম—

প্রণাম জানালেন তার জননী জন্মভূমি স্বর্গাদপি গরীয়সীকে। বললেন মনে মনে,—হে আমার মাতৃভূমি, ভারতবর্ষ! বেদ-প্রসবিনী গরীয়সী মা, গ্রহণ কর দীন সন্তানের প্রণতি। আবদ্ধ কর আমাকে বাহুপাশে। তোমার প্রগাঢ় স্পর্শে ধন্য কর আমার মৃত্যুলাঞ্ছিত অভিযান। তুমি আমাকে ভোলনি। তাই আবার ডাক দিয়েছ আকুল সুরে ব্যাকুল হয়ে। আমি এসেছি, এসেছি তোমার সৌরভ-স্নিগ্ধ কাশ, কমলা, জুঁই, মল্লিকার উদ্যানে। এসেছি তোমার ব্যথাদীর্ণ

হাহাকারে। শক্তি দাও। দাও দুর্জয় তপস্যার মন্ত্রটি শিখিয়ে। আমি দূর করব সকল বাধা। উল্লঙ্ঘন করব তোমার শৃঙ্খল। আসুক বন্যা, হোক আকাশ মেঘাকীর্ণ ঘন ঘোর। বিদ্যুৎ ঝলুক। বাজ পড়ুক। হোক আকাশে উল্কাপাত! আমি বাধা মানব না। চলব এগিয়ে। এগিয়ে যাব তোমার চোখের জল মোছাতে। হাসির শুভ্রতা ফোটাতে। যাব তোমার কান্নায় আনতে বিজয়ের অট্টহাসি। তুমি দাঁড়াও, দাঁড়াও আমার পথে এসে প্রতিরোধ হয়ে। আমি তাই ভেঙ্গে যাই। যাই তোমার যোগ্য সন্তানের মত মুক্তির স্থির নিশ্চিত সীমানায়। হে দেব-লীলাস্থল, দেবভোগ্যা জন্মভূমি, গ্রহণ কর আমার অকুণ্ঠ প্রণাম। রাত ভোর হলো। জাহাজ এগিয়ে এলো কূলের দিকে।

কিন্তু সতীর্থদের মনের আকাশে সঞ্চারিত গেল দ্বন্দ্বের অন্ধকার। ভাবল তারা—এ আবার কেমন ভাব? সন্ন্যাসী হবে সর্বত্যাগী বৈরাগী। কি ছাই কেবল বলছে আর্তজনের সেবা! আর কলুষকে কোল দিতে।

শুনতে পেলাম স্বামিজীর স্পষ্ট প্রত্যুত্তর,—"বহুজনহিতায় বহুজন-সুখায় সন্ন্যাসীদের জন্ম।"

প্রাণটা রাখতে হবে হাতের মুঠায়। জীবের ক্রন্দনে যদি প্রয়োজন হয় ঐ মুঠা দিতে হবে খুলে। " 'আত্মা নো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ'—আমাদের জন্ম। কি কচ্ছিস্ সব বসে বসে? ওঠ্—জাগ্ নিজে। নিজে জেগে অপরকে জাগ্রত কর—নরজন্ম সার্থক করে দিয়ে চলে যা।"......তোমরা কি মনে কর আর্ত, রোগী, অনাথাদের সেবা করা, তাদের দুঃখ দূর করবার চেষ্টা করলেই অমনি মায়ায় বদ্ধ হয়ে যেতে হবে?......তোমরা কি মনে কর যে শ্রীরামকৃষ্ণকে আমার চেয়েও ভাল বুঝেছ।...তোমরা যে ভক্তিকে লক্ষ্য করছো তা আহাম্মকের ভাবুকতা মাত্র। যা মানুষকে করে তোলে কর্মবিমুখ ও কাপুরুষ।..."

ভুলে যায়নি আজও সেই প্লেগের বীভৎস দিনগুলো। যেদিন উদাত্ত আহ্বান দিয়ে সতীর্থ ও ভক্তদের ডেকে বলেছিলেন স্বামিজী কোমর বেঁধে আর্তদের সেবাব্রতে ঝাঁপিয়ে পড়তে। বলেছিল এক সতীর্থ,—"স্বামিজী টাকা কোথা থেকে আসবে?" অগ্নিদৃপ্ত কণ্ঠে বলেছিলেন স্বামিজী,—"মঠের জন্য ক্রীত জমি বিক্রয় করে টাকার সংস্থান করব। ভয় নেই। টাকার অভাব হবে না। না হয় গাছতলায় থাকব। তবুও এদের আগে বাঁচাতে হবে।"

সেই জাগ্রত সত্যের বাণী-দীপটি আজো জ্বলছে অনির্বাণ।

"যত্র জীব তত্র শিব।"

এসো, নেমে এসো। তোমরা তপের আসন থেকে কষ্টের ফেনিল তরঙ্গে। কোটি মৌন ভারতবাসীকে দেখিয়ে দাও তাদের কল্যাণের উন্মুক্ত দিগন্ত। রেখে দাও ফুলের অর্ঘ্য আর দেবধূপের প্রস্তুতি। শান্তিস্বর্গ রচনা কর এই মর্ত্যের মাটিতে। তিনি তোমার ঐ ক্ষুদ্র ঘরে ফুলের অর্ঘ্য নেয়ার জন্য বসে নেই—কবির ভাষায়—

"তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙ্গে
করছে চাষা চাষ,
পাথর ভেঙ্গে কাটছে যেথায় পথ
খাটছে বারো মাস।"

* * * *

"আপনি প্রভু সৃষ্টি বাঁধন পরে
বাঁধা সবার কাছে।"

সতীর্থদের মুখ গেল চূর্ণ হয়ে। বাউল বিদ্রোহীর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে তারাও যেন বলতে পেলে খুশী—

"তোমার কাছে আরাম চেয়ে পেলাম শুধু লজ্জা—
এবার সকল অঙ্গ ছেয়ে পরাও রণসজ্জা।"

ঈশ্বর উপাসনা গ্রহণ করল তারা সেবাধর্মের মধ্যে।

রামকৃষ্ণানন্দ যাত্রা করল দাক্ষিণাত্যে বেদান্ত প্রচার করতে। অভেদানন্দ আর সারদানন্দ রইল পাশ্চাত্ত্য দেশে। আর অখণ্ডানন্দ গেল দুর্ভিক্ষ-পীড়িত আর্তজনের সেবায় মুর্শিদাবাদে।

এইখানেই সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ ও মানুষ বিবেকানন্দের অপূর্ব সংমিশ্রণ আমরা দেখতে পাই। আজন্ম বৈরাগী তবুও ধরণীর দুঃখকে তিনি ভুলতে পারলেন না! মানুষের কান্না, মানুষের লাঞ্ছনা তাঁর অন্তরকে নাড়া দিল থেকে থেকে। তাইতো মোক্ষকামী সন্ন্যাসী নেমে এসেছিলেন ধ্যানাসন থেকে এই মর্ত্যের মাটিতে মানুষের জয়গান গাইতে।

প্রেমপুরুষ শ্রীচৈতন্য

শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূবে গেয়েছিলেন ভক্ত কবি চণ্ডীদাস—

"আজু কে গো মুরলী বাজায়।
এত কভু নহে শ্যাম রায়॥
ইহার গৌর বরণে করে আলো।
চূড়াটি বাঁধিয়া কেবা দিল॥"
*　　*　　*　　*
চণ্ডীদাস মনে মনে হাসে।
এরূপ হইবে কোন্ দেশে॥"

ভোরের পাখীর মত প্রেমিক-কবির কণ্ঠে ধ্বনিত হলো যুগ-মানসের প্রভাতী সঙ্গীত। স্পষ্ট দেখতে পেলেন অনাগত দিনের স্বর্ণালী দীপ্তি। ঊষর মরুপ্রান্তে ধূসর সন্ধ্যার বুকে প্রতিভাসিত হলো প্রেম-পুরুষের প্রস্নিগ্ধ মূর্তি।

কবির কণ্ঠ হলো মুখর। নৃত্য করে উঠলেন আনন্দে। গাইলেন মনের খুশীতে—"এ রূপ হইবে কোন দেশে।"

এ রূপের আধার হলো বঙ্গদেশ। বাঙলার অণুতে অনিয়ানে প্রাণিত হয়ে রয়েছে ভক্ত সাধকদের প্রেমের অশ্রু। যার প্রভাবে কবির অন্তরের সিংহদ্বার ভেঙ্গে গিয়ে সেখানে শতদলের মত প্রকীর্ণ হয়েছিল পদলালিত্যের মাধুরিমা। প্রকট হয়ে উঠেছিল আকাশ-

বিসারী অন্তর স্বর্গে সুন্দরের তনুকান্তি। দেখতে পেয়েছিলেন তিনি—দেখতে পেয়েছিলেন বাল্মীকির মত ঋষিদৃষ্টিতে মানব-মুক্তির মহানায়ককে।

তাইতো গাইলেন,—"এরূপ হইবে কোন দেশে !"

কালের কুটিল কটাক্ষে বাঙলার গণজীবনে নেমে এলো আত্ম-নিগ্রহের চরম শাস্তি। ডুকরে কেঁদে উঠল বেদনাক্লিষ্ট প্রাণ। প্রার্থনা করল দুঃখযামিনীর বুকে সুখ-শান্তির সজীব স্পর্শ। দেখতে চাইল উন্মত্ত হিংস্র প্রবৃত্তির প্রান্তিক রেখায় নবারুণের লোহিত লেখা। কারণ ভক্তির কৃপণতায় বন্ধ্যা মনের বহিঃপ্রকাশের মাঝে দিনের পর দিন যে সব আচার-অনুষ্ঠান চলছিল, তা মানব-মুক্তির পথে মানস-সরোবরের পীযুষ-প্রশান্তি না ছিটিয়ে রেখে যাচ্ছিল গোবি সাহারার মুঠা মুঠা উত্তপ্ত বালু। ফলে আত্মদহনের বেদনা উঠল বহ্নিমান হয়ে। সমাজ হলো কলুষ-মলিন। চলল পশুবলির আনন্দ। মদ্যপানের উন্মত্ততা। ভক্তপ্রাণ ভগবানের নামে নানা ভ্রান্ত আচার-অনুষ্ঠানের উচ্ছৃঙ্খল প্রকাশের মাঝে মানুষ অন্তর থেকে নেমে এলো বাইরের দুয়ারে। প্রাণের স্পর্শ নেই। নেই হৃদয়ের যোগাযোগ। কেবল বাহ্যাবরণের মত্ততায় সত্য ছেড়ে তারা রপ্ত করতে লেগে গেল মিথ্যার কণ্টক।

কেঁদে উঠল প্রাণ। প্রাণ কেঁদে উঠল প্রেমসর্বস্ব মানুষদের। চোখের জলে বুকের ব্যথায় আকুল হয়ে কাঁদল তারা যুগ-মানসের মানবিক প্রকাশ প্রার্থনা করে। এই কান্নার সাধকদের মধ্যে প্রধান ছিলেন নবদ্বীপের অদ্বৈতাচার্য।

বাঙলার মরমী সাধকেরা দুঃখবাদের মধ্য দিয়েই এগিয়ে গিয়েছিলেন সাফল্যের সোনালী প্রভাতে। অন্তরের বেদনাকে নিবেদন করেছেন হৃদ্-রাজনের চরণতীর্থে অশ্রুর নির্যাসে। সাধনাকে রূপান্তরিত করেছিলেন

একটা মানবিক আবেদনে। এবং যুগ-মানসের জড়-চেতনায় প্রাণের স্পর্শ দিয়ে করতে চেয়েছিলেন অনুভূতির জীবন্ত বিগ্রহ। সোনার ফসল ফলল। বাঙলার আকাশ বাতাস পবিত্র গন্ধীর মত মানুষের আবছা চেতনাকে মুক্তি দিল আড়ষ্ট আবেষ্টন থেকে। নিয়ে এলো ভাবসমুদ্রের পারে।

ক্ষেত্র তৈরী না হলে অঙ্কুরিত হয় না বীজ। বৃষ্টি বর্ষিত হয় না মেঘ না জমলে আকাশে। ঠিক তেমনি অন্তরাকাশে ভাবের প্লাবনে ভক্তির উদ্রেক না হলেও আসেন না ভক্তের ভগবান। নবদ্বীপের ঘরে ঘরে যখন বেদনার বন্যায় প্রদোষের যৌবন চঞ্চল হয়ে উঠেছিল— ঠিক তখনই প্রেমের অবতার নবদ্বীপচন্দ্র শচীদেবীর কোলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব হয়েছিল।

১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ১৮ই ফেব্রুয়ারীতে চৈতন্যদেবের জন্ম হয়।

তখন ছিল আকাশ-ভরা জোছনার স্নিগ্ধ হাসি। বাতাসে বনের মর্মরিত সঙ্গীত। পাখীরা সবে নীড়ে ফিরে যাচ্ছে। ঘরে ঘরে বেজে উঠেছে মঙ্গল শঙ্খ। মন্দিরে বাজছে ঘণ্টা। ফাল্গুনী পূর্ণিমা। সন্ধ্যা উতরে বেজেছে ৭টা। এমনি মধুর লগ্নে শচী মাতার জঠরজাত চন্দ্র অন্তরাকাশের দেবতা ধরাধামে অবতীর্ণ হলেন কলিহত জীবকে কোল দিতে।

> "নবদ্বীপে আছে জগন্নাথ মিশ্রবর।
> বসুদেব প্রায় তেঁহো স্বধর্ম্ম তৎপর॥
> তার পত্নী শচী নাম মহা পতিব্রতা।
> দ্বিতীয় দেবকী যেন সেই জগন্মাতা॥
> তার গর্ভে অবতীর্ণ হৈলা নারায়ণ।
> শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম সংসার ভূষণ॥"

পুত্রের তনুকান্তি দর্শন ক'রে তপোমৌন জগন্নাথ মিশ্র তৃপ্ত হলেন।

রাখতে চাইলেন নয়নে নয়নে। পণ্ডিত জগন্নাথ মিশ্র নিজে জ্ঞানী গুণী হয়েও পুত্র পাছে সংসার ছেড়ে যাবে এই ভয়ে বললেন—

"এহি যদি সর্ব্বশাস্ত্রে হবে গুণবান্।
ছাড়িয়া সংসার সুখ করিবে পয়ান॥
অতএব ইহার পড়িয়া কার্য্য নাই।
মূর্খ হৈয়া ঘরে মোর থাকুক নিমাঞি॥"

দুরন্ত বালক। মানে না নিষেধ। শাসনের উক্তিকে দেখলে মুখ টিপে হাসে। ব্রাহ্মণগণ তাই গঙ্গাস্নানে নামলে ডুবুরির মত জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে নিমাঞি। ডুব দিয়ে যায় জলের অতলে। কোথা থেকে এসে পা ধরে টান দিয়ে নিয়ে যায় নামিয়ে। চিৎকার ক'রে ওঠে ব্রাহ্মণগণ। আবার কেউ এসে নালিশ জানায় জগন্নাথ মিশ্রের কাছে—আমার শিবলিঙ্গ চুরি করে নিয়ে গেছে তোমার ছেলে। কেউ এসে বলে আমার উত্তরী নিয়ে পালিয়ে গেল গো। শুধু কি তাই? গঙ্গার ঘাটে বালিকার দল আসে স্নান করতে। শিশু চৈতন্যপ্রভু এগিয়ে যান তাদের কাছে। মাথায় ফেলে দেন দূর থেকে ওকড়ার বীচি। কালো এলোচুলে জড়িয়ে যায় তা। মুখ ভার করে তারা। হানে কুটিল কটাক্ষ। চুলে জড়ান ওকড়ার ফল টেনে তোলে মাথা থেকে। ছিঁড়ে যায় চুল। বলি এ জ্বালা কারো সয়? রোষভরে মেয়ের দল চলে আসে শচীদেবীর কাছে। জানায় নালিশ। বলে কত কথা। আবার তার মধ্য থেকে—

"কেহ বলে মোরে চাহে বিভা করিবারে।"

পাঁচ বছরের ছেলে। বিয়ের কি বোঝে? তাই নালিশ গুরু হলেও শাস্তিটা হতো লঘুই। আদর করে শচীদেবী ছেলেকে টেনে আনেন বুকে। চুমু খান। বলেন দুষ্টুমি একটু কম করতে। কিন্তু বালকের চাঞ্চল্য কি আর কমে? সে যেন আরো বেড়ে যায়। মা এবারে রক্ত-নেত্রে শাসন করেন। বলেন বিরক্তিভরে একটু শান্ত হতে। কিন্তু দিন

দিনই তার উপদ্রবে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে গ্রামবাসী। বাধ্য হয়ে মা-বাবা ছেলেকে তুলে দেন গঙ্গাদাস পণ্ডিতের হাতে। এই গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে এসে চৈতন্য মহাপ্রভুর বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ ঘটতে থাকে ধীরে ধীরে। এ সময় আমরা আরো দুজন পণ্ডিতের নাম শুনতে পাই। তাঁরা হচ্ছেন, বিষ্ণুদাস ও সুদর্শন।

বাল্যের লীলাপীঠ ছেড়ে মহাপ্রভু পদপাত করলেন শিক্ষানিকেতনে! শুরু হলো তাঁর জীবনের পট-পরিবর্তন।

"শুভ দিনে শুভ ক্ষণে মিশ্র পুরন্দর।
হাতে খড়ি পুত্রের দিলেন বিপ্রবর॥"

এত দিনের অশান্ত অন্তর শান্ত হলো প্রভুর। রূপান্তরিত হলো দুরন্ত দুষ্টুমি একাগ্রতায়। মন চলে এলো মধ্যাহ্নের চাঞ্চল্য থেকে প্রভাতের প্রশান্তিতে।

লেখাপড়া করে নিমাই। ডুবে থাকে পুথির পাতায়। অকাতরে ইন্ধন দেয় হাসি-আনন্দের দিনগুলো। তন্ময়ের মত লেখে ক, খ, গ। উচ্চারণ করে মধুর কণ্ঠে। যে শোনে সে যায় মুগ্ধ হয়ে। বিহ্বলের মত এগিয়ে আসে বালকের কাছে। তাকিয়ে থাকে বিস্ময়ের চোখে।

"কি মাধুরী করি প্রভু ক, খ, গ, ঘ বোলে।
তাহা শুনিতেই মাত্র সর্ব্বজীব ভোলে॥"

ভুলবে না কেন?

ও কণ্ঠে মেশান রয়েছে হৃদয়ের মাধুরী। প্রাণের পরিবেশে প্রত্যাসন্ন হয়েছে শুভ লগ্নের সূর্য। অন্তর রূপান্তরিত হয়েছে মন্দিরে। সেখানে যে বাজছে দেবতার পদনূপুর। তারই প্রতিধ্বনিতে মুখর নিমাই। তাই তো ও কণ্ঠ বড় মধুর। বড় প্রাণ হরণ কারণ হয়ে চিত্তে এনে দেয় নিত্যের ভাবনা। টেনে নিয়ে যায় মনকে দহন থেকে শান্তির লীলা-পুলিনে।

একাগ্র মন। অসীম ধৈর্য। আহারে বিহার নেই। নেই রুচি মুখে। দিবস-যামিনী কেবল নাম মধুরে ডুবে থাকতে চায় সে—

ডুবে থাকতে চায় আপন মনে।

"কি স্নানে কি ভোজনে কিবা পর্য্যটনে।
নাহিক প্রভুর আর চেষ্টা শাস্ত্র বিনে॥"

সমাপন হলো বাল্যের শিক্ষা। কীর্ণ হলো প্রজ্ঞার দীপ্তি। পণ্ডিত হলেন নিমাই—পণ্ডিত হলেন ব্যাকরণ-শাস্ত্রে। শুধু তাই নয়—খ্যাত হলেন অদ্বিতীয় ব'লে সারাটা নবদ্বীপে। কেউ পারে না তাঁকে তর্কযুদ্ধে পরাভব করতে। হার মেনে যায় বড় বড় পণ্ডিত। নত মস্তকে মেনে নেয় নিমাইর প্রভুত্ব। মুরারী গুপ্ত—বড় পণ্ডিত। এলেন তিনি নিমাইর সঙ্গে তর্কযুদ্ধে। কিন্তু কি ফল লাভ করলেন তিনি? লাভ করলেন পরাজয়ের গ্লানি।

"প্রভু কহে বৈদ্য তুমি ইহা কেন পড়।
লতা পাতা নিয়া গিয়া রোগী দৃঢ় কর॥
ব্যাকরণ শাস্ত্র এই বিষম অবধি
কফ পিত্ত অজীর্ণ ব্যবস্থা নাহি ইথি॥"

পথে-প্রান্তে জনতীর্থে নিমাইর নাম। দেখা হলো একদিন গদাধর পণ্ডিতের সঙ্গে পথে। নিমাই কি তাঁকে ছেড়ে দেবেন? আক্রমণ করলেন তাঁকে। থমকে দাড়ায় গদাধর। নিমাই তাঁকে যুক্তিতর্কে হারিয়ে দিয়ে উল্‌টো মুক্তির লক্ষণ কি জিজ্ঞেস করে বসলেন। কি জবাব দেবে গদাধর পণ্ডিত? চুপ হয়ে গেল সে। একটি কথাও আর বের হলো না মুখ দিয়ে। এমনি করে নিমাই পণ্ডিত বিজ্ঞজন-মহলে পণ্ডিত বলে খ্যাত হয়ে গেলেন। নদীয়ার চাঁদ নিমাইর প্রতিভায় বিমুগ্ধ হয়ে গেল নবদ্বীপবাসী। অবশেষে একটি টোল খুলে বসলেন তিনি। ছাত্রের ভীড় জমল। আকৃষ্ট হলো তারা নিমাইর রূপ ও গুণে।

মুগ্ধ হলো তাঁর বুদ্ধি ও মেধায়। এমন দেখেনি আর কোথাও কেউ। এ যেন বাক্‌সিদ্ধ পুরুষ। টোলের গৌরব বাড়ে—

বাড়ে নিমাইর নামের সুরভী। বিশ বছরের যুবক শতাব্দীর প্রদোষ প্রচ্ছায়ে দাঁড়িয়ে আলোর আশ্বাসে মুগ্ধ করে দেন জনচিত্ত। যেমন রূপ, তেমন গুণ। কণ্ঠে যেন ক্ষরছে নিয়ত মধু।

এবারে নিমাই বৃহত্তর জীবনের পটভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন। দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত কেশব কাশ্মীর আহ্বান করলেন নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলীকে তর্কযুদ্ধে। জানেন না কেশব কাশ্মীর কে এসেছেন নবদ্বীপে শচীদেবীর অঙ্কে। গর্বোন্মাদ কেশব কাশ্মীরের সঙ্গে নিমাই পণ্ডিত এসে মিলিত হলেন গঙ্গার তীরে। মুখোমুখী বসলেন দুজনে। লোকে লোকারণ্য। সবাই উন্মুখ। তরুণ পণ্ডিত নিমাই তাঁকে বর্ণনা করতে বললেন গঙ্গার শোভা। সহজ ভাব ও উপমা-মাধুর্যে শ্রোতৃমণ্ডলীর মন হরণ করলেন পণ্ডিত। কিন্তু নিমাই হতে পারলেন না তুষ্ট। তিনি নানা আলঙ্কারিক দোষ বের করে কেশব কাশ্মীরকে পরাস্ত করে দিলেন। বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেল সভা। নদীয়ার জনতীর্থে নিমাইর জয় ঘোষিত হলো। পড়ে গেল দিকে দিকে আনন্দের সাড়া।

এমনি দিনে নিমাইর জীবনে পরম বৈষ্ণব ঈশ্বরপুরীর আবির্ভাব ঘটে। ঈশ্বরপুরী তাঁকে ধর্মকথা শুনিয়ে ধর্মপথে টানতে চাইলেন। কিন্তু লীলাবিলাসী নিমাই রঙ্গরসের গঙ্গাস্রোতে ঈশ্বরপুরীর সমস্ত উপদেশাবলী ভাসিয়ে দিয়ে তাদের সঙ্গে হাস্য-পরিহাস করতে কুণ্ঠিত হতেন না। অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত নিমাই উপরে রুক্ষতার কাঠিন্য লাগিয়ে অন্তরের ভাবদ্বার খুলে বসতেন। দিন দিন ঈশ্বরপুরী তার লীলা-সহচর হয়ে উঠলেন। তাকে দেখলে নিমাই আনন্দে আত্মহারা হয়ে যেতেন। আত্মহারা হয়ে যেতেন শ্রীধর এবং গদাধরকে দেখেও।

এবারে শুরু হলো পূর্ববঙ্গ-পর্যটন। মানুষের অন্তরে নিমাই প্রতিষ্ঠিত করেছেন সম্রাটের আসন। নিমাইর টীকা-টিপ্পনী প্রচলিত হয়েছে পূর্ববঙ্গের টোলগুলিতে। সেখানের পণ্ডিতগণ নিমাইকে তাদের মধ্যে পেয়ে বললেন—

"উদ্দেশে আমরা সবে তোমার টিপ্পনী।
লই পড়ি, পড়াই শুনহে দ্বিজমণি॥"

পূর্ববঙ্গ পর্যটন করে ফিরে এলেন নিমাই ঘরে—নবদ্বীপে। শুনলেন এসে সর্পদংশনে মৃত্যু হয়েছে স্ত্রী লক্ষ্মীদেবীর। মা শচীদেবী পুত্রকে অঙ্কে ধারণ করে কেঁদে কেঁদে বলতে লাগলেন লক্ষ্মীর অপমৃত্যুর কথা।

মাকে সান্ত্বনা দিলেন নিমাই। দিলেন প্রবোধ। কিন্তু আপন অন্তরের আগুন তো নেভে না। থামে না বিরহী বাঁশরীর সুর। হৃদয়ে ছায়া পড়ে গৈরিক পথের। গোধূলির গানে বেদনার সঞ্চার হয় মনে। তবুও তাঁকে বিয়ে করতে হলো, বিয়ে করতে হলো জননীর মুখপানে তাকিয়ে। বিয়ে করতে হলো বিষ্ণুপ্রিয়াকে।

কিন্তু নববধূর রূপে ভোলে না নিমাইর মন। বাজে না অনুরাগের বাঁশী। আনন্দের স্পর্শ-কাতরতায় ফিরে আসে না সজীবতার রঙ্গমহলে। নিমাই নীরব, শান্ত। তার অন্তর অনন্তের অভিসার-আয়োজনে ব্যস্ত। মায়ার ছায়া নেই। নেই আসক্তির প্রীতিলেখা। কেবল এক সুর এক পথ তার মানস নয়নে বারে বারে আভাসিত হতে লাগল। সে সুর একতারার। সে পথ গৈরিক। স্থির হয়ে গেছে সিদ্ধান্ত। যাবেন তিনি গয়াধামে।

কেন?

পিতৃপিণ্ড দান করতে। এ তীর্থযাত্রার পশ্চাতে লুক্কায়িত ছিল নিমাইর অনাসক্ত মনের অনন্ত পথের সন্ধান-লিপ্সা। এবং সে আকুলতার উৎস খুঁজতে গেলে স্পষ্টই আভাসিত হয় লক্ষ্মীদেবীর

অপমৃত্যুর কারণটি। যদিও বহির্দৃষ্টিতে পিতৃপিণ্ড-দানই মুখ্য কারণ ব'লে মনে হয়। কিন্তু সত্যিই কি তাই? এ চিন্তার অবকাশ আসে বৃন্দাবন দাসের একটি উক্তিতে।

শচীদেবী নববধূর হাত ধরে নিয়ে এলেন পুত্রের সম্মুখে। কিন্তু নিমাই কি করলেন?

"দৃষ্টিপাত করিয়াও প্রভু নাহি চায়।"

এই যে বিবাগী মন এ তো বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রতি অনুরাগের প্রমাণ দেয় না। লক্ষ্মীদেবীকে হারিয়ে নিমাই উদ্‌ভ্রান্ত। অসীমের লীলাপথে তার দৃষ্টি বিসারিত। গয়াধামে এলেন নিমাই। দাঁড়ালেন অঞ্জলি দিতে। কিন্তু দর্শন হলো অপূর্ব এক জ্যোতিচ্ছটার। নিমাই মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন। রুদ্ধ হয়ে গেল কণ্ঠ। নয়ন সিক্ত হলো আতুর অশ্রুতে। নিমাই কেঁদে কেঁদে বললেন সঙ্গীদের কাছে—"তোমরা ঘরে ফিরে যাও, আমি আর সংসারে যাব না; আমি প্রাণেশ্বরকে দেখতে মথুরায় চললেম।"

ভাবোন্মাদ নিমাই। ভক্তির রস-সমুদ্রে অবগাহন করে ভেসে চললেন অনাদি কালের স্রোতে। বিপদে পড়ল সঙ্গীরা। দিল কত প্রবোধ। কত অনুরোধ করল তারা নিমাইকে। অবশেষে ঘরে ফেরবার মন করলেন তিনি। ওরা নিয়ে এলো নিমাইকে নবদ্বীপে। প্রেমোন্মত্ত বালক এবারে গুরুর সন্ধানে বের হলেন। নাম পেলেন কেশব ভারতীর কাছে। গ্রহণ করলেন সন্ন্যাস। গুরু নতুন নাম দিলেন তার শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য। প্রভু নিত্যানন্দের আনন্দে নৃত্য করে উঠলেন। আহা সে কি রূপ! এ রূপের মাধুরিমায় অন্তর অশান্ত হয়ে ধেয়ে চলে। প্রাণের তটে যমুনার জোয়ার আসে। কাতরিমার কান্নায় বক্ষ ভেসে যায়। এমন রূপ ভুবনে কেউ কখনো দেখেনি আর। পতিতা সত্যবাঈ, লক্ষ্মীবাঈ প্রতারণার প্রবৃত্তি লয়ে এসে কুড়িয়ে নেয় তাঁর চরণ-

রেণু। অশ্রু-অর্ঘে পূজো করে প্রেমের পূর্ণিমাচন্দ্র নিমাইর চরণ-তীর্থ। শুধু তাই নয়—যে দেখে ও রূপ চোখে, সে যায় বিমুগ্ধ হয়ে। দস্যু ভীলপন্থ নারোজী লুটিয়ে পড়ে তার চরণে। বলে, প্রভু কৃপা কর।

চোখের জল আর বুকের ব্যথা দিয়ে রচিত হয়ে যায় প্রেমের স্বর্গ। নিমাই ভাবের নভে পাখীর মত উড়ে যেতে চান। জড়িয়ে ধরেন তমাল বৃক্ষ। হরি আমার প্রাণনাথ বলে অজ্ঞান হয়ে পড়েন কদম্ব বৃক্ষের পানে তাকিয়ে। চোখের পাতা থেকে ঘুম ঝরে পড়ে। নিশীথের নির্জনে অন্তর-শান্তির দেবতাকে খোঁজেন। বিলুপ্ত হয়ে যায় বাহ্যজ্ঞান। অশ্রুর অর্ঘে ভেসে যান প্রভু। ভেসে যান তৎপুরুষের তনুকান্তি দেখতে। ঠিক এমনি অবস্থা হয়ে ছিল শ্রীরাধার। কৃষ্ণ-প্রেম পাগলিনী বিরহ-বেদনায় অধীর। কৃষ্ণ-চিন্তায় আনন্দ। কৃষ্ণ-ভাবনায় শিহরণ। কৃষ্ণ-স্বপ্নে প্রীতি। কেবল কি তাই? কৃষ্ণ-নাম জপ করতে করতে অবশ হয়ে যায় তার তনু। জ্ঞান-গরিমার ঊর্ধ্বে বিরহিণী রাই ভাব-মৌন। লিখেছেন চণ্ডীদাস—

"তুলীআনি দিল নাসিকা মাঝে।
তবে সে বুঝিল শোয়াস আছে॥"

শ্যামের বাঁশী বেজেছে কুঞ্জে। সে মধুর বংশীধ্বনি এসে প্রবেশ করেছে শ্রীরাধার কর্ণে। সঙ্গে সঙ্গে মর্মরিত হয়ে উঠেছে তার হৃদ-বৃন্দাবনের বিজনকুঞ্জ। আর কি রইতে পারে? অধীরা রাধা, শ্যাম-বিলাসিনী রাই অতলায়িত হয়ে গিয়েছে ভাব-কালিন্দীর অতলে। বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত। বিস্মৃতির অতলান্তে হারিয়ে গিয়েছে তার সচেতন সত্তা। অভিসারিকা শ্যাম-সম্ভোগে যাবার আয়োজনে ব্যস্ত—

"রাই সাজে বাঁশী বাজে পড়ি গেল উল
কি করিতে কিবা করে সব হৈল ভুল।

করেতে নূপুর পরে পায়ে পরে তাড়
গলেতে কিঙ্কিণী পরে কটি তটে হার
চরণে কাজর পরে নয়নে আলতা
হিয়ার উপরে পরে বঙ্করাজ পাতা।"—বংশীবদন

প্রেমের প্রবাহে উন্মাদিনী রাই ঝাঁপিয়ে পড়েছে। বিদিশার গহন তলে জীবনের যৌবন বিলিয়ে দিয়ে ভেসে চলেছে এক অব্যক্ত আনন্দের রস-সায়রে। অনুভূতির অদৃশ্য স্পর্শে প্রাণে এসেছে পুলকের শিহরণ। শ্যাম আসছে। শ্যাম ডাকছে। বাজছে শ্যামের বাঁশী। বিনোদিনী রাধা পুষ্প-সুগন্ধির মতই মধুর উপলব্ধির আকাশে কৃষ্ণ-স্পর্শ প্রাণের সরসতা উপলব্ধি করছে। দাবদগ্ধ মরুর বুকে বারিবর্ষণে যে শান্তি—ঠিক অনুরূপ শান্তির স্পর্শে সজীব হয়ে উঠছে তার হিয়া। শ্রমের আতিশয্যে ক্লান্ত বর্ষার নিশীথরাত্রে একাকী পা টিপে টিপে শ্যাম-সন্দর্শনে চলেছে শ্রীমতী—

"তুয়া দরশন আশে কছু নাহি জানলুঁ
চির দুখ অবসুখ ভেল
পন্থক দুঃখ তৃণহুঁ করি গণলুঁ
কহতহি গোবিন্দ দাস।"

হোক পথ বন্ধুর। পিচ্ছিল। কর্দমাক্ত। এতটুকু খেদ নেই শ্রীমতীর অন্তরে। তার কাছে তার নিজের বেদনা, দহন, দুঃখ অতীব তুচ্ছ। সে ভাবছে শ্যামতনুর কথা। এমন ঘন বর্ষা। আকাশে চমকে যাচ্ছে বিদ্যুৎ। ঝর্‌ঝর্ করে অঝোরে ঝরছে জল। কি ক'রে শ্যাম আসবে? কেমন ক'রে এ পিছল পথে পা টিপে টিপে পথ চলবে? ঘর বার করছে শ্রীমতী। পথপানে তাকিয়ে তাকিয়ে অধীর হয়ে যাচ্ছে। তার তো উৎকণ্ঠার অন্ত নেই। সমস্ত বনস্থলী যেন স্তব্ধ শান্ত হয়ে গিয়েছে। ব্যাকুল রাধার আকুল আর্তির সঙ্গে সঙ্গে তৃণ-গুল্মও যেন

বেদনা-ক্লিষ্টের মত মূক-মূর্তি হয়ে গিয়েছে। এ মধু-যামিনী তো অনাদি কালের নয়। এ যে ক্ষুদ্র। ক্ষণস্থায়ী। তবে যদি শ্যাম আসতে আসতে কেটে যায় রজনী! কত প্রশ্ন। কত দ্বন্দ্ব। রাধার মনে বেদনার বিলাপ—

"মধু যামিনী অতি ছোটি।
নিমিখ মানয়ে যুগ কোটি॥"

তবে কি এ মধু-যামিনী ভোর হয়ে যাবে? আসবে না কি আমার প্রেমপুরুষ। তবে কেন, কেন এ দেহে এত ঐশ্বর্য? এত কান্তি? যদি এতটুকু স্পর্শ না পাই আমার শ্যামের! বরিষণ ঘন মেঘ-পুঞ্জির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে রাধা রিক্ত প্রাণে সিক্ত নয়নে শ্যামের আগমন-প্রতীক্ষায় উন্মুখ। কিন্তু তার মাঝেই আবার দুর্যোগ-পথের ভাবনায় বিমর্ষ—

"এ ঘোর রজনি মেঘ গরজনি
কেমনে আয়ব পিয়া
শেজ বিছাইয়া রহিলুঁ বসিয়া
পথ পানে নিরখিয়া।"

এই পথ পানে তাকিয়ে থাকবার বেদনাময় অধ্যায়টি মহাপ্রভুর জীবনেও প্রকট হয়ে উঠেছিল। অশ্রু, কম্প, পুলকাদি তার দেহ-কোষেও এনে দিয়েছিল কৃষ্ণ-ভাবের সুরধুনী। হা কৃষ্ণ, হা কৃষ্ণ বলে উন্মত্ত কালিন্দী ভ্রমে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন জলাধারে। আত্ম-বিসর্জনের মাঝ দিয়ে চেয়েছিলেন তিনি আত্ম-দহনের শান্তি। শীতের রজনী, তপনের কটাক্ষ, বর্ষার নির্ঝর এবং বোশেখের প্রলয় প্রভঞ্জন তার যাত্রাপথের অন্তরায়গুলি পারেনি তাঁকে আটকে রাখতে ঘরে।

বৈষ্ণব ধর্ম নিছক উপলব্ধির ধর্ম। অন্তরকে দেব-বাসরে রূপান্তরিত না করতে পারলে এ উপলব্ধি মানুষের বোধগম্য হতে চায় না। কিন্তু

মুখের কথায় তো আর হৃদয়কে বৃন্দাবনের নিকুঞ্জ করা চলে না। চাই ভাব। ভাবের ভাবুক হয়ে তবে করতে হয় যাত্রা। কিন্তু সে ভাব-ই বা আসবে কিসে? কোন মন্ত্রগুণে হৃদাঙ্গনে বেজে উঠবে ভাবের বাঁশী? এখানেই এসে যায় ভক্তিবাদের কথা। বৈষ্ণব দর্শনের মৌলিক পরিচয়টুকু নিহিত রয়েছে ভক্তিবাদের মধ্যেই। ভক্তি-রসের নদীতে অবগাহন করতে করতেই যেতে হয় ভাব-সাগরের পারে। সেখানে অন্তহীন অনন্ত পারাবার। অনুভূতির অমৃত প্রস্রবণে হৃদয়ের সকল প্রবৃত্তি যখন এক এক ক'রে অতলায়িত হয়ে যায় তখনই ভক্তি হয় শুদ্ধ। এবং এই শুদ্ধা ভক্তিই বৈষ্ণবদের একমাত্র 'সাধ্য'। এই শুদ্ধা ভক্তির সংগা নির্ণয় করে বলেছেন কবিরাজ গোস্বামী—

"অতএব শুদ্ধ ভক্তির কহিয়ে লক্ষণ॥
অন্য বাঞ্ছা অন্য পূজা ছাড়ি 'জ্ঞান কর্ম'।
আনুকূল্যে সর্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন॥
এই শুদ্ধ ভক্তি ইহা হৈতে প্রেম হয়।
পঞ্চ রাত্রে ভাগবতে এই লক্ষণ কয়॥"

এই প্রেমের টানে মনো-সায়রে যে ভাবোচ্ছ্বাসের সৃষ্টি হয়েছিল তাতেই ভেসে গিয়েছিলেন তিনি অসীমের লীলাপথে। সে পথ প্রেম জ্যোতিতে উজ্জ্বল। ভালোবাসায় স্নিগ্ধ। অনুরাগে রঞ্জিত এবং বেদনায় সুন্দর।

প্রেম কি? আর সেখানে যাবার পথটি আবিষ্কার করবার উপায় কি? প্রেম-ধামে পৌঁছিবার সড়ক হলো শুদ্ধা ভক্তি। এই শুদ্ধা ভক্তিই এনে দেয় অন্তরে অনন্তের ঠিকানা। সে ঠিকানা জানতে হলে দেহ শুদ্ধি করতে হয় কৃষ্ণ-বিরহাগ্নির প্রতপ্ত জ্বালায়। সে জ্বালার শান্তি সম্বন্ধে বলেছেন কবিরাজ গোস্বামী—

"কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়।
তবে সেই জীব সাধু-সঙ্গ করয়॥

সাধু সঙ্গ হৈতে হয় শ্রবণ কীর্তন।
সাধন-ভক্ত্যে হয় সর্বনার্থ নিবর্তন॥
অনর্থ-নিবৃত্তি হৈলে ভক্তি-নিষ্ঠা হয়।
নিষ্ঠা হৈতে শ্রবণাদ্যের রুচি উপজয়॥
রুচি হৈতে হয় তবে আসক্তি প্রচুর।
আসক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে রতির অঙ্কুর॥
সেই রতি গাঢ় হৈলে ধরে প্রেম নাম।
সেই প্রেম প্রয়োজন সর্বানন্দ ধাম॥"

ভক্তি ও নিষ্ঠার প্রকাশের মধ্য দিয়েই আসক্তির পথটি আভাসিত হয়। এবং সেই আসক্তির মধ্য দিয়েই জন্মলাভ করে রতি ও গাঢ় রতি। এই গাঢ় রতিরই আর-একটি নাম হলো প্রেম।

এর প্রধান লক্ষণ কি?

সমস্ত ইন্দ্রিয়কে কৃষ্ণমুখী করা। মন, বুদ্ধি, জ্ঞান, গরিমা সব কিছুকে কৃষ্ণ-প্রীতি ইচ্ছায় উৎসর্গ করতে পারলে তবে লাভ হয় বিশুদ্ধ প্রেম। এই বিশুদ্ধ প্রেমের বিমুক্ত ধারায় বিযুক্ত হতে পারলেই বিমলানন্দ লাভ হয়। এবং মহা ভাবে ভাবমৌন হয়ে আত্মরতির সুখ-সায়রে অবগাহন করা চলে। এ ভাব হয়েছিল শ্রীমতীর। আর সেই মূর্তিমতী রাধাই বৈষ্ণব ভক্তদের অন্তরে মহাভাব বলে অভিহিত। এবং সেই ভাব-সিদ্ধিই তাদের ভক্তিপথের তীর্থপীঠ। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলেন—

"কৃষ্ণেতে আহ্লাদে তাতে নাম আহ্লাদিনী।
সেই শক্তি দ্বারে সুখ আস্বাদে আপনি॥
সুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন।
ভক্তগণে সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ॥
হ্লাদিনীর সার অংশ ধরে প্রেম নাম।
আনন্দ বিস্ময়-রস প্রেমের আখ্যান॥

প্রেমের পরম সার মহাভাব জানি
সেই মহা ভাবরূপা রাধা ঠাকুরাণী ॥”

এই রাধা ঠাকুরাণীর পরিপূর্ণ প্রকাশ প্রেমের পাগল গৌর-গুণমণির মাঝে মূর্ত হয়ে উঠেছিল। উপলব্ধির মাঝে উপভোগের রসানুভূতির বিচিত্র প্রকাশ আমরা মহাপ্রভুর জীবনে দেখতে পেয়েছি। এই রাধা-প্রেমের স্বরূপ উপলব্ধির জন্যে কৃষ্ণকেও ধারণ করতে হয়েছিল নরদেহ। চরিতামৃতে দেখা যায়—

“শ্রীরাধায়াঃ প্রণয় মহিমা কীদৃশ বানয়ৈবা
স্বাস্থ, যেনাদ্ভুত মধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যং চাস্যা মদনুভবতঃ কিদৃশং বেতি লোভ্যা,
তদ্ভাবঢ্যঃ সমজনি শচী গর্ভসিন্ধৌ হরীন্দু।”

‘রাধা-কৃষ্ণ’ দ্বৈত প্রেমমূর্তিই মহাপ্রভু রূপ অদ্বৈত আধারে রূপ-মধুর হয়ে উঠেছিল। এক কথায় বলতে গেলে গৌরলীলাই রাধা-কৃষ্ণ প্রেম-প্রবাহের প্রত্যক্ষ কালিন্দী।

'খেয়া'-কাব্যের কবি

'খেয়া'-কাব্যের পটভূমিকার কিছুটা স্বাক্ষর এখানে রাখা দরকার। তা না হলে কবির কাব্যিক-মৌসুম-পথে জনমনের যাত্রা ব্যাহত হবে।

ঝঞ্ঝা-মন্দ্রিত বাংলা। রাজশক্তির প্রবল প্রতাপে জর্জরিত বাঙ্গালী। সম্মুখে তার সমস্যা-সঙ্কুল পথ। একদিকে বিভেদের খড়্গে বঙ্গমাতার বক্ষ-বিভাগের আয়োজন আর-একদিকে চলছিল তখন লাঞ্ছিত সন্তানের আমরণ সঙ্কল্প-ঘোষণা—না, আমরা বাংলাকে ভাংতে দেব না।

কবির মনেও বেজে উঠল সে রুদ্র ডমরু। রইতে পারলেন না তিনি এক কোণে 'শুধু খেলিবার বাঁশী নিয়ে' একমনে বসে। নেমে এলেন জনসমুদ্রে। এলেন কবি অগ্নিবীণায় ঝঙ্কার দিয়ে। সভায় দাঁড়িয়ে শোভাযাত্রার পুরোধায় বক্তৃতার আগুন-বর্ষণে, গানের গতিচ্ছন্দে ও ছোট-বড় কাগজের মাধ্যমে দেশের কাজে দশের হিতে আত্মোৎসর্গ করলেন কবি। শক্তিশালী করে তুললেন কর্মমুখর উদ্দীপনায় স্বদেশী আন্দোলনকে। কিন্তু সংকীর্ণ জাতীয়তার পতাকা বইতে মহামানবতার কবি নারাজ। ক্ষুদ্র স্বার্থের যূপকাষ্ঠে কেমন করে বৃহৎকে ঠেলে দেবেন? এ যে তার সাধন-মানসে নীতিহীন বলেই তিনি জেনেছেন। মানুষের মনুষ্যত্বকে, মানুষের শাশ্বত ধর্মবোধকে জাতীয়তার অনেক উর্ধ্বে কবি স্থান দিয়েছেন। তাইতো যখন দেখলেন, গঠনমূলক কার্যে নতুন শিক্ষা-দীক্ষার আদর্শে, দেশকে নবরূপায়ণের স্পৃহা থেকে দেশবাসী বিরত, তখন তার মন মুখর মধ্যাহ্ন থেকে, বিপ্লবের প্লাবন থেকে দাঁড়াল ফিরে।

এলো তাঁর জীবনে এক বিরাট বিবর্তন। জনসমুদ্র গেল স্থির স্তব্ধ হয়ে। থমকে দাঁড়িয়ে তারা প্রত্যক্ষ করল, প্রত্যক্ষ করল কবির এই স্খলন-বেদন।

ভাবের পাগল বসলেন বেঁকে। সরে দাঁড়ালেন কল কোলাহলের মুখরতা থেকে। ফিরে এলেন বাহির বিশ্ব থেকে, এলেন শান্তি-নিকেতনের ছায়াঘন বীথিবনে—অন্তর বিশ্বে। 'খেয়া'-কাব্যের জন্ম এখানেই।

এর আগে 'চৈতালিতে' দেখতে পাই কি? কবির মনে একটা বৃহত্তর জীবনের রূপ-রস-আস্বাদনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা।

কবি নিমগ্ন পুরাণ ও ইতিহাসের গভীরে। তাদের ত্যাগ, তিতিক্ষা ও মহত্ত্বের মাধুর্যে কবির অন্তরমন তন্ময়। ভোগের রাজ্য থেকে ক্রমে বিরতির বেলাভূমে, ত্যাগের তপোবনে অধ্যাত্ম জীবনের রস-সম্ভোগে যাত্রার আয়োজন।

পার্থিব জগতের সংসার, কর্মময় জীবনের মুখরতা ও মায়াঘন মনের ছায়াছবি বিস্মৃতির অতলান্তে তলিয়ে দিয়ে একেবারে সত্য সুন্দরের মধ্যে নিজেকে উৎসর্গ করে দিয়েছেন কবি। উপনিষদের অধ্যাত্ম সাধনার মধ্যে কবি ভগবানকে উপলব্ধির অধিকারী করে নিয়েছেন। জ্ঞান-ভক্তির কিছু আভাস মাত্র ঘটেছে তাঁর 'নৈবেদ্যে'। 'নৈবেদ্যে' ভগবান কবির কাছে বিরাট এক ঐশ্বর্যময় অনাদি অনন্ত। তাইতো দীনাতি দীন প্রার্থনা 'নৈবেদ্যের' পাতায় পাতায় মূর্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু 'খেয়ায়'? ভগবান কবির একান্ত কাছের। কবি এক নতুন রাজ্যে তার সাথে রস-আস্বাদনে তন্ময়। তত্ত্ব নয়, নয়তো জ্ঞান-দর্শনের পথে, এখানে কবি তাঁর লীলাময়কে প্রাণের প্রবাহে, প্রেমের আকুলতায় প্রাণে-মনে, দেহে-গেহে উপলব্ধি করতে চেয়েছেন। খেয়ায় ভগবান কবির একান্ত কাছের একান্ত অন্তরের, একেবারে বর ও বধূর বেশে।

অসীমকে সীমায় ধরা, অরূপকে রূপে পাওয়া ও জ্ঞানের অগম্যকে প্রেমের মোহনায় নিয়ে আসার বাসনাই 'খেয়া'-কাব্যের বৈশিষ্ট্য। এই রূপাতীতের রস-সম্ভোগে কবি আকুল মনে কখনো ঘাটে, কখনো পথে এবং কখনো ঘরে পাগল হয়ে ছুটোছুটি করেছেন। এই ঘাট, পথ ও ঘর এদের কেন্দ্র করেই কবির 'খেয়া'-কাব্য। এক কথায় বলতে গেলে, 'খেয়া' এই তিনটি অবস্থার আবর্তন-বিবর্তনের স্বাক্ষর। ঘাটে বসে কবি কি দেখলেন? দেখলেন ওপারে গাঢ় ঘন অন্ধকার। গুণ্ঠনের আবরণ। তার মাঝে যেন কি এক অজানার ভাব-বৈচিত্র্য। পথ দিল বিছিয়ে তার শ্যাম সমারোহ। ডাকল যেন হাতছানি দিয়ে।

আর ঘর?

ঘর করল রচনা মায়া মোহিনী দিয়ে শ্রান্তিহীন সুখ-নিকেতন।

এখানে এসে মানুষ তার জীবনের হিসেব নিকেশ মেলাতে বসে।

মানুষ এই ত্রিমোহনায় এসে কখনো চঞ্চল, কখনো অধীর আবার কখনো বিমুগ্ধ বিস্ময়ে তন্ময় হয়ে যায়।

-কেন?

তার অন্তরের চির-বাঞ্ছিত, চির-আকাঙ্ক্ষিত বহু সাধনার ধনকে ক্ষণেক দর্শন আবার ক্ষণেক অদর্শনের বেদনায় ও আনন্দে।

এই সংঘাত-মুখর ঝঞ্ঝাবর্তের মধ্যে দিয়ে চলেছে মানুষ তার অসীমের অজানার খোঁজে। তাইতো জীবনের গতিছন্দ তিনটি সীমানায় সীমিত হয়ে ছুটছে। ছুটছে পথ, ঘর ও ঘাটে। কবি 'খেয়া'-কাব্যেও এই তিনটি মোহনার বাঁকে এসে উল্টো পাড়ি ধরার আগ্রহে আকুল। চারিদিক থেকে তো চীৎকার করে উঠল সবাই। কেউ বলল কবিকে বাউল। কেউ বলল, অনুকরণকারী কবি পাশ্চাত্ত্যের। আবার কেউ বা আখ্যা দিল, মন্ত্রশিষ্য বনে গেছেন কবি বৈষ্ণব কবিদের। কিন্তু দুঃখ ও পরিতাপের এই যে, অন্তর দৃষ্টির রশ্মিশলায়

কবির মানসলোকের খোঁজ নিলে না কেউ। স্রষ্টা থেকে সৃষ্টির অবিচ্ছিন্ন সত্তা যে কল্পনাতীত একথা তলিয়ে দেখার অবসর পেল না তারা। বলে চলল মনের খেয়ালে—'খেয়া'-কাব্যের কবি নেমে এসেছেন, নেমে এসেছেন তার স্বীয় সত্তা থেকে এক কোণে বীথি-বনে। যে ছিল বিশ্বের দরদী, সর্বমানবের মুক্তিসাধক, সে এখন আপন মুক্তির নেশায় পরমার্থের সন্ধানে ধ্যানমগ্ন। কেবল তুমি আর আমিতে নিবদ্ধ তার কাব্যিক আর্তি।

কিন্তু এমন হোল কেন?

একটু তলিয়ে দেখলে হয়তো এর সমাধান মিলবে। ১৩১২ সালের আষাঢ় থেকে ১৩১৩ সালের শ্রাবণ অবধি 'খেয়ার' রচনাকাল। এর পূর্ব্বে ১৩০৯ থেকে ১৩১৩ সালের মধ্যে পত্নী, কন্যা ও কনিষ্ঠ পুত্রের বিদায় বিরহে বিধুর কবির অন্তর। পরমাত্মীয়ের মৃত্যু করল কবির নির্মেঘ চিত্তাকাশে বিষাদের হিম-মলিন ছায়া-সম্পাত। মূর্চ্ছিত হলেন কবি। তারপর রাজনৈতিক আন্দোলন। অক্লান্ত কর্ম ও নিরবচ্ছিন্ন শ্রম। কিন্তু তার ফলস্বরূপ যখন কবি দেখলেন, দেশবাসীর উন্মত্ত, উত্তেজিত ভাব, তারা চলেছে অকল্যাণের অসত্যের তাণ্ডবলীলায় নীতিভ্রষ্ট হয়ে, তখন কবি মনে করলেন, তার সব কাজ, সব শ্রম বুঝি ব্যর্থ হোল। মঙ্গলের শুভশঙ্খ বাজাতে গিয়েও পারলেন না কবি তাতে ফুৎকার দিতে। তাইতো একটা বেদনার অসহ্য গ্লানি ও নৈরাশ্য নিয়ে আদর্শ বিমুখতার রঙ্গমঞ্চ থেকে পিছিয়ে পড়লেন কবি নীরবে।

সরে আসার আরও যে একটি কারণ না আছে তা নয়। তা হচ্ছে কবির দীর্ঘ রস-সাধনায় বিমুখতা। রবীন্দ্রনাথ কবি। তাঁর অন্তরে রসভোগের তৃষ্ণা। রূপ-রসের আস্বাদনই হোল কবির কাব্যিক প্রেরণার উৎস। তাই নিয়ে দীর্ঘ দিন তিনি একটানা

রসরঙ্গে আপনাকে মিলিয়ে দিয়ে করলেন বদ্ধ-রুদ্ধ সরোবরে হংস-মিথুন খেলা।

এই চিরাচরিত এক-মুখো রস-সাধনায়, এই সৌন্দর্যে এই অভিসারে তার মন যেন তৃপ্তি পাচ্ছিল না। তাইতো কবির তন্‌হাতুর মন অজানার অনন্তে, পরমাত্মার লীলারসে ডুব দিতে চাইল। 'খেয়া'র কবি নতুন জীবনের রস-সম্ভোগে অন্তহীন অথৈ সাগরের পারে এসে হাজির হোলেন।

কিন্তু অবাক লাগে বটে। অবাক লাগে তবুও তার 'এই কর্ম ও ধর্মজীবনের দ্বৈত রূপ দেখে। মনে হয় যেন কর্মময় জীবনের এ চঞ্চলতা বুঝি বিষণ্ণ মনের বিষাদকে ঢাকার একটা সযত্ন প্রয়াস। কিন্তু কর্মের আবর্ত থেকে ধ্যানলোকে এলেই, চেতন মনকে ছায়াচ্ছন্ন করে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। যার সাথে নাড়ির যোগ রয়েছে তাকে কি মুহূর্তে ভুলে যাওয়া সম্ভব? তাইতো তিনি যোগ-বন্ধন ছিন্ন করে নির্জন নিকেতনে মনের মন্দিরে সমাসীন হয়েও শুনতে পেলেন যেন ভেসে আসছে অতীতের মায়াবিনীর ছায়া-সংকেত। সংসারকে যারা একান্ত-ভাবে ভালোবাসল, গ্রহণ করল যারা তাকে প্রাণ দিয়ে, মন দিয়ে, নিবিড় গভীরভাবে, তারা তো ঘরের ধর্ম-কর্ম, ভোগ-সুখ লাভ করে তাতেই করল অর্পণ নিজেকে। এরা সুখী। ফিরে গেছে শান্ত, সুখী মন লয়ে জীবনের পড়ন্ত বেলায়। আর যারা মায়া-মোহের বাঁধন ছিঁড়ে আসক্তি ও আনন্দের মদির আবেশকে ভুলে, পার্থিব জগতকে বিস্মৃতির অতলান্তে তলিয়ে দিয়েছে, তারাও সুখী। ত্যাগ, বৈরাগ্যের গৈরিক আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে তারা এক অনন্ত অতীন্দ্রিয়ের রসঘন আনন্দে আত্মরতির সুখ-সায়রে নিমজ্জিত।

কিন্তু যে নেই পারে—নেই নীড়েও? তাকে কে তুলবে হাত ধরে? পিছু থেকে হাতছানি দিচ্ছে ঘরের মায়া, মন চায় বিরতির পথে

অনাসক্তির তীর্থে পদসঞ্চার করতে। কিন্তু দ্বন্দ্ব-দোলার মাতাল সমীর যে মাঝে মাঝে ছন্দপতন ঘটিয়ে যায়! এই দোটানার চঞ্চল আবেশে কবি করুণ কান্নায় মিনতি জানান পরমপুরুষের কাছে সায়াহ্ন সন্ধ্যায় বড় অসহায়ভাবে—

"ঘরে যারা যাবার তারা কখন গেছে ঘর পানে ;
পারে যারা যাবার গেছে পারে ;
ঘরেও নহে পারেও নহে যে জন আছে মাঝখানে
সন্ধ্যাবেলা কে ডেকে নেয় তারে।"

সংঘাত-মুখর সংসারের কলকোলাহলের মাঝে যেন কবি তার জীবনের পরিতৃপ্তি ও সার্থকতা খুঁজে পাচ্ছেন না। প্রেম ও সৌন্দর্যের রসাস্বাদ করতে পাচ্ছেন না। তাই বাসনা, কামনার সকল চাঞ্চল্য ও বিক্ষোভকে অতিক্রম করে এখন কবি শ্রান্তিহীন শান্তিময়ের অঙ্ক মেগে বেড়াচ্ছেন। পরমাত্মার কাছে তার আকুল আকুতি জানিয়ে বলছেন—বিশুষ্ক যৌবন। জীবনের গতিপথে শ্লথ লগ্ন। আশা নেই। নেই উৎসাহ উদ্যম। আলো নেই দিনের। শেষ হয়েছে ইহলোকের সব খেলা। কিন্তু কই? পরলোকের আহ্বান, আলো ও কান্তি তো এখনো এলো না! নিরাশ হয়ে জীবনের উপান্তে সেই খেয়াঘাটে এসে কবি ডাকছেন, ডাকছেন তার মননয়কে, সুন্দরকে আর্ত করুণ স্বরে—

"ফুলের বাহার নাইকো যাহার ফসল যাহার ফলল না
চোখের জল ফেলতে হাসি পায়—
দিনের আলো যার ফুরাল সাঁঝের আলো জ্বলল না,
সেই বসেছে ঘাটের কিনারায়।
ওরে আয়।
আমায় নিয়ে যাবি কেরে—
খেয়া শেষের শেষ খেয়ায়।"

'ঘাটের পথে'ও দিনের কাজ চুকিয়ে দিয়েছেন। শেষ করেছেন জলভরা। অধীর প্রতীক্ষায় আকুল হয়ে বসে আছেন ঘরের দ্বারে। যাবেন না আর বাইরে। যাবেন না ঘাটের পথে। মিশবেন না সঙ্গীদের সঙ্গে। কর্ম-কোলাহলে না মেতে এখন কবি চিত্তকে সংহত করে সেই অনন্ত অমৃতময়ের ধ্যানে শান্ত সমাহিত হবেন—

"আজ ভরা হয়ে গেছে বারি—
আঙিনার দ্বারে চাহি পথপানে
ঘর ছেড়ে যেতে নারি।"

এসেছে জীবন-স্বামীর সাথে মধুর মিলনের শুভ লগ্নটি। গোধূলির মদির লগ্নে প্রিয়তমের সঙ্গে হবে শুভদৃষ্টি। একান্তে তাই বাসর-শয্যা রচনা করতে হবে। সব কাজ ফেলে রেখে, সব ব্যথা ভুলে গিয়ে নববধূর বেশে সাজবেন আজ—

"আমার দিন কেটে গেছে কখন খেলায়—
কখন কত কী কাজে।
এখন কি শুনি পূরবীর সুরে—
কোন দূরে বাঁশি বাজে।
বুঝি দেরি নাই, আসে বুঝি আসে
আলোকের আভা লেগেছে আকাশে
বেলা শেষে মোরে কে সাজাবে ওরে
নব মিলনের সাজে?"

অভিসারিকা সেজে কবি সেই পরম সুন্দরের সাথে যুক্ত হবেন। যুক্ত হবেন রাধিকা-বধূর বেশে। দেখতে পাই এখানে কবির বৈষ্ণব ভাব! বৈষ্ণবরা বলে থাকেন—পুরুষ আর প্রকৃতি। পুরুষ সেই বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণ। আর প্রকৃতি? প্রকৃতি হোল জীবজগতের সমস্ত জীব। শ্রীরাধা। এই রাধা-কৃষ্ণের রসঘন রূপেই প্রকৃতি ও পুরুষের

লীলাখেলা। ভক্ত আর ভগবান। কেবল এই দুটো ধারাই বৈষ্ণবদের মূল কথা! ভক্ত হোল সেই পরমাপ্রকৃতি শ্রীরাধা। আর ভগবান হোলেন সেই পরমপুরুষ শ্রীবৃন্দাবন নন্দন শ্রীকৃষ্ণ। কবি এখানে বালিকা বধূবেশে নিজেকে ক্ষুদ্র একটি ভক্ত বলে অনুভব করছেন সেই পরম পুরুষের কাছে। সে তো কত বিরাট কত মহিমায় উজ্জ্বল তার কান্তি। ছোট্ট বধূ তাই তার প্রেমজনের থৈ পাচ্ছে না। তবুও তার মাঝে নিবিড় গভীর যোগ রয়েছে। যোগ রয়েছে সেই লোকাতীত অনন্ত অনাদীশ্বরের সাথে। তাকে দেখেছে বধূরূপ কবিচিত্ত স্বামিরূপে। আর বধূ হোল তার লীলা-সঙ্গিনী। মিলতে হবে এই স্বামি-সোহাগের রাগ-অনুরাগে। কেমন করে? বধূ আর বর—এই দুই যুক্ত ধারার মুক্ত মোহনায় প্রেমিকের সাথে প্রেয়সী হয়ে। যদিও আজ বধূ ছোট্ট একটি বালিকা, কিন্তু দিনান্তে যখন তার যৌবন-কাননে কুসুম ফুটবে, প্রেমের যমুনায় উজানের কলতান জাগবে, তখন এই ছোট্ট বধূ চিনবে তার স্বামীকে। এ যে কেবল খেলাবারই সঙ্গী নয়, সেকথা সেদিন বধূর মরমে রণিত ধ্বনিত হবে। যুবতী হবে প্রণয়িনী। প্রেমের পরশ মধুরে আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে বধূ বরের দর্শন-স্পর্শনের জন্যে হয়ে উঠবে আকুল! একথা অবিশ্যি বর জানে—

"একদিন এর খেলা ঘুচে যাবে—
ওই তব শ্রীচরণে।
সাজিয়া যতনে তোমারি লাগিয়া
বাতায়ন তলে রহিবে জাগিয়া
শত যুগ করি মানিবে তখন
ক্ষণিক অদর্শনে—
তুমি বুঝিয়াছ মনে।"

বাংলার বৈষ্ণবদের মতো 'সুফী'দেরও ঐ ভাব। আবার 'সুফী'দের সাথে যোগ রয়েছে বাংলার বাউলদের গভীরভাবে। সব উল্টো পথের পথিক। উল্টো সাধন-মার্গে আরূঢ় হয়ে জীবনতরী ভাসাল তারা 'যমুনা বহত উজানে।' 'নাথ' ও 'যোগীদের' বৈশিষ্ট্যও এই উল্টো সাধনে।

রবীন্দ্রনাথের 'খেয়া'ও এসে এই উল্টো উজানে পাড়ি ধরবার জন্যে উন্মুখ হয়ে আছে। কবি ক্ষুদ্র আমিত্বকে বিসর্জন দিয়ে বিশ্ববোধের মধ্যে পরমার্থের সন্ধানে বৃহৎ আমিত্বকে বিস্তার করে দিয়েছেন।

কিন্তু বৈষ্ণবদের সাথে রবীন্দ্রনাথের একটু পার্থক্য আছে। তা হচ্ছে এই—বৈষ্ণব কবিগণ এগিয়েছেন একটা নির্দিষ্ট লীলাতত্ত্বকে অবলম্বন করে। এগিয়েছেন তারা তাঁদের বৈষ্ণব দর্শনের প্রতিষ্ঠিত পথে। রয়েছে তাঁদের সাধন-পদ্ধতি, ধর্মমত ও রসোপলব্ধির একটা ধরা-বাঁধা ছন্দ।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের তো কোন ধর্মমত নেই। নেই তো কোন সাধন-পদ্ধতি। তিনি তো ধ্যানস্থ হয়ে সাধক সাজেন নি। রবীন্দ্রনাথ কবি। কাব্যের স্পন্দিত সুর-তরঙ্গের বিচিত্র পথ-পরিক্রমার পরে তিনি এসে এমন একটি ধাপে বা স্তরে পৌঁছেছেন, যেখানে তাঁর কবিতায়, গানে ঈশ্বর উপলব্ধির চরম তরঙ্গ স্পন্দিত হয়ে উঠেছে। এ উপলব্ধি, এ অনুভূতি, এ ভাব তাঁর একান্ত আপনার অন্তরের জিনিষ।

'খেয়া'-কাব্যখানা মানবাত্মার স্বতঃস্ফূর্ত বেদন-বিক্ষোভের না-পাওয়ার চিত্র। আপনাকে ভূমার সাথে যুক্ত করার একটা ঐকান্তিক বাসনা এতে উদগ্র রূপ পরিগ্রহ করেছে। এ শুধু পূর্বরাগ, আর্তি ও তন্ময়তা। সমাধি সুদূরে। 'গীতাঞ্জলি'তে এসে কবি পূর্ণ পরিণতি লাভ করে আত্মানন্দে মগ্ন হয়ে গেছেন।

আপাতদৃষ্টিতে দেখতে গেলে বলতে হয়, ভারতীয় সাধনার ঐক্য সাধন হয়েছে এই 'খেয়া' ও 'গীতাঞ্জলি'তে। কেবল 'তুমি' আর 'আমি'

সারাখানা কাব্যে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। স্পষ্ট হয়ে উঠেছে অনুরাগ, আবেগ, বিরহ, আনন্দ ও আসক্তি।

কার জন্যে ?

ইন্দ্রিয়াতীত অতীন্দ্রিয়ের সম্রাটের জন্যে।

তাই তো কবির মন নেই আর কোন দিকে। পথ চলতে চায় না দেহ। শুধু অনন্তের পথরেখায় তার স্থির অপলক দৃষ্টি। অনন্তের অভিসারে ধাবমান অন্তর তনহাতুর মনে ছুটতে ছুটতে অবশেষে 'রসো বৈ সঃ।' সেই রসঘন আনন্দের অনিন্দ্য কান্তির দিব্য-ভাস্বর জ্যোতিরিঙ্গনে নিজেকে সমাহিত করার বাসনাই কবিকে নিয়ে এসেছে খেয়া-ঘাটে।

কবি জয়দেব

বিলুপ্তির অন্ধকারে লীন হয়ে যায় নি কেন্দুবিল্বের অস্তিত্ব। এখনো তেমনি বয়ে চলেছে অজয়ের কীর্ত্তন-কণ্ঠ। ভেসে আসছে ঘন নিস্বন। সে লীলায়িত তরঙ্গ-ছন্দ যেন রাধা-গোবিন্দের পদ-বন্দনার জন্যে উঠেছে মুখর হয়ে। চলেছে কবি-তীর্থের পল্লবে পুষ্পে মর্মরী জাগিয়ে। চলেছে লক্ষকোটি মানুষের অন্তরকুঞ্জে কথা কয়ে কয়ে। তাই তো আজও পৌষ সংক্রান্তির পুণ্য দিনে লক্ষ মানুষের অবিচ্ছিন্ন মিছিল এসে স্থির হয়ে দাঁড়ায়, দাঁড়ায় কবির লীলা-ধন্য মৃত্তিকার পীঠস্থানে। অর্জ্জন করে জীবনের সবচেয়ে সেরা ধন।

একাদশ শতকের মধ্যভাগ। উদ্ধত ভুজঙ্গের মত পাশব ক্ষুধায় উন্মত্ত মানুষ। সমাজে ব্যভিচার। মোহমলিন জাতি। রাজশক্তির প্রদীপ্ত সূর্য অস্ত-সুপ্তির ঘরে। নির্বাপিত হয়ে গিয়েছে বাঙালীর প্রাণবহ্নি। দিকে দিকে ভক্ত-প্রাণ মানুষের অন্তরে জেগেছে কাতরিমার কান্না। ঠিক এমন এক প্রদোষ লগ্নে কবি জয়দেব আবির্ভূত হ'য়েছিলেন বীরভূমের কেন্দুবিল্ব গ্রামে।

"ভিক্ষা মেগে খায় সদা হরিনাম জপে
হাসে কাঁদে নাচে গায় শিবের মণ্ডপে।"---(বনমালী দাস)

আজও এ মন্দির তার অস্তিত্ব লয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এখানে আছে একখানা উপল খণ্ড। অঙ্কিত রয়েছে তার' পর অষ্টদল পদ্ম। কিংবদন্তি, জয়দেব নাকি এই যন্ত্রে মন্ত্র জপ ক'রেছিলেন ভুবনেশ্বরীর। লাভ

করেছিলেন সিদ্ধি। অবশ্য এ সম্বন্ধে জানতে হলে বীরভূমের ইতিহাসের দিকে আমাদের দৃষ্টিপাত করতে হয়।

বীরভূমের পূর্বনাম ছিল 'কামকোটী'। অবিশ্যি মহেশ্বরের কুল-পঞ্জিকা বৈ এ প্রমাণ আর কোথাও পাওয়া যায় না। সেখানে পাওয়া যায়—

"কামকোটী বীরভূম জানিবে নির্যাস।"

অনেক অতীতের এ কাহিনী। তখন ছিল 'কামকোটী' সুহ্ম দেশের অন্তর্গত। সুহ্মের উল্লেখ সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহের কোনই কারণ থাকতে পারে না। কারণ দণ্ডীর 'দশকুমার চরিত', কালিদাসের 'রঘুবংশ', বানভট্টের 'হর্ষচরিত', এবং কবি ধোয়ীর 'পবন দূতে'ও সুহ্মের নামটি পাওয়া যায়। কিন্তু পরে তা নাকি পরিচিত হয় পাল রাজগণের 'সামন্ত শাসন' রূপে। তাদের সর্বোপরি কর্তা ছিল শূর বংশীয় রাজা। অবিশ্যি সেন বংশের প্রভুত্ব বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গেই শূরদের শাসন-সূর্য চিরদিনের মনে অস্ত-সুপ্তির কোলে ঘুমিয়ে পড়ল। সুহ্ম সরাসরি চলে এলো সেনদের ছত্র-প্রচ্ছায়ে। মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠের মতে —সুহ্মা রাঢ়াঃ।

এ নামটির সঙ্গে অনেক অতীত ঐতিহ্য বিজড়িত রয়েছে। অবশ্য এর আয়ুষ্কাল সম্বন্ধে সঠিক কিছুই এখনো পাওয়া যায় নি। তবে হ্যাঁ, রাঢ়ের উল্লেখ পাওয়া গেছে অনেক ক্ষেত্রেই।

যথা—'ধঙোর' লিপি। ঐতিহাসিকগণ বলে থাকেন—'ধঙোর দ্বারাই নাকি আক্রান্ত হয়েছিল রাঢ়। আক্রান্ত হয়েছিল ১০০২ খৃষ্টাব্দে। বল্লাল সেনের তাম্র শাসন থেকেও এ নামের পরিচয় মেলে। শুধু তাই নয়—এ লিপি সেন বংশের এক নিখুঁত পরিচয় বহন করে আজও অমলিন রয়েছে। কেউ কেউ এ কথাও বলে থাকেন যে, সেন বংশের দ্বারাই রাঢ় গৌরবমণ্ডিত ও গর্বিত হয়েছে। এবং তাদেরই সৌর্য, বীর্য ও

বীরত্বের বিজয়গাথা বহন করবার জন্যেই এদেশের নাম হয়েছিল বীরভূম।

বীরের মৃত্যু হয়। পতন ঘটে সাম্রাজ্যের। কিন্তু বেঁচে থাকে মানুষের সাহিত্য। বেঁচে থাকে ধর্মের ইতিহাস। যুগ যুগান্তের ঝঞ্ঝাবর্তের মধ্যে পড়ে তা হয়ত বিধ্বস্ত হয়। ধূলি মিনারের অতলে অবলুপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু পৃথিবীর স্পন্দনের স্পর্শে একদিন সে বোবা লিপিও প্রত্নতাত্ত্বিকের তপদৃষ্টিতে ভাস্বর হয়ে ওঠে। রেডিয়ামের মত দ্যুতিময় হয়ে যায় লুপ্তপ্রায় কৃষ্টির কাজল লেখাগুলি। সেদিন বিস্ময়ের আর অবধি থাকে না। মানুষও তখন এগিয়ে আসে তার অতীতের ঐতিহ্যময় দিনগুলির কাহিনী জানবার জন্য। ধীরে ধীরে আবিষ্কৃত হয় তাম্রলিপি। খুঁজে বের করে বহু কীর্তির সাক্ষী সেই উপল-খণ্ড। ইতিহাসের নির্দেশ নামা লয়ে সুপ্ত কীর্তির বুকে চলে তখন মন্থন। সে মন্থনে কি ওঠে? ওঠে অমৃত ও বিষ দুইই।

রাঢ়কে এক দিক থেকে বিচার করলে বলা যেতে পারে রত্নগর্ভা। কেন? তার জবাবে শুধু এই বললে যথেষ্ট হবে মনে করব যে—একদিন বাঙলার সাহিত্য, ধর্ম, ইতিহাস ও রাজনীতির অনেকটা অংশই রাঢ় দেশ থেকে এসেছিল। সঙ্গে এ কথা বললেও বোধ হয় ভুল বলা হবে না যে, এ দেশের নিজস্ব ধর্ম বলতে বৈষ্ণব ধর্মকেই বোঝাত। এই বৈষ্ণবধর্ম এ দেশের স্বতন্ত্র সম্পদ ছিল বলে 'শুশুনিয়া' লিপি প্রমাণ দেয়। গুপ্ত সম্রাটের সময় থেকেই এ দেশে বৈষ্ণব ধর্মের প্রচলন ছিল। এবং তা যে গুপ্তদের দ্বারা আমদানি হয় নি তাও মিথ্যা নয়। এবং এই রাঢ় থেকেই ভারতের দিকে দিকে বৈষ্ণব ধর্মের অনন্ত মাধুর্যের কীর্ত্তন-কণ্ঠ বিঘোষিত হয়েছিল। শুধু তাই নয়, বাঙলার গণজীবনের 'পর তার পেলব মধুর মাধুরী বিস্তার করে দিয়ে এক অপূর্ব প্রেম তরঙ্গের অমৃত প্রবাহে তাদের স্নাত করিয়ে দিতেও সক্ষম হয়েছিল। এইখানেই রাঢ়ের মহিমা। এ

দেশের ধর্ম ও সাহিত্যের দুটি ধারা একদিন একই সঙ্গে যেন কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে চলেছিল। কবি জয়দেবও সে প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারেন নি।

কবি জয়দেবকে নিয়ে ইতিপূর্বে বহু আলোচনাই হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তবুও বলতে হবে জয়দেব ফুরিয়ে যান নি বলেই মানুষের চেতনায় তিনি এসে ধরা দিচ্ছেন নব নব রূপে। সেই রূপ মাধুরীর মধুর আবেশে কবিকে নিয়ে আলোচনা করবার একটা সহজ মন জেগে ওঠে। আজিকার এ আত্মবিস্মৃতির দিনে কবি-স্মৃতি স্মরণ করবার যে কতটা প্রয়োজন তা আমরা এখনো বুঝে উঠতে পারছি না। আর তা পারছি না বলেই মানুষের সৃষ্টির মাঝে ঢুকেছে কতগুলি ক্ষণস্থায়ী খেয়ালি কল্পনা। যা না আসে কাজে, না বাজে তাতে হৃদয় বীণার সুর। তা শুধু একটা নির্দিষ্ট সময়কে কেন্দ্র করে দুচার দিনের আসর জমান গান গেয়েই যায় ফুরিয়ে। কালজয়ী হবার স্বপ্ন বা সাধনা তাদের মধ্য থেকে স্ফুরিত হতে চায় না।

আত্মবিস্মৃতির যুগ বলছি বলে হয়ত কথাটি কারো কারো কাছে ভালো লাগবে না। সে তো চিরাচরিত প্রথা। নদীর এ কূল ও কূলের মতোই এ পার ও পারের নিন্দা গেয়ে গেয়ে চলে যায়। ধরা যাক আলোচ্য কবির কথাই—কেউ কেউ জয়দেবের গীতগোবিন্দ পড়ে বলেছেন—গীতগোবিন্দে গীত আছে, কিন্তু গোবিন্দ আছে কিনা সন্দেহ। তাঁর কাব্যে নাকি আদিরসাধিক্য এতটা উগ্র রূপ ধারণ করেছে যে, তাতে শ্লীলতার সীমা ছাড়িয়ে একেবারে অশ্লীলতার পঙ্ক-বহুল আলোড়ন তুলে দিয়েছে।

এর জবাব আছে দুটি। একটি হলো এই যে—যুগ ও জীবনের প্রভাব থেকে কবি বা সাহিত্যিক বিমুক্তির প্রত্যাশা করলেও তা সহজ-লভ্য নয়। তাদের সারাখানা মনকে একটা অদৃশ্য শক্তি এমন ভাবে জুড়ে বসে থাকে যে তারই কটাক্ষে কবি-প্রাণ সহজেই দৃশ্যবস্তুর মধ্য

দিয়ে তার প্রাণ-প্রবাহকে অনন্ত উৎসের সঙ্গে মিলিয়ে দেয়ার জন্যে ছুটে চলে। এ চলা যেমন নিরন্তর নিশীথের যৌবনকে আবক্ষ আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে শান্তি পায়, তেমনিই আবার সেই বাহুবন্ধনীর মাঝে একদা অলক্ষে এক অনন্ত শক্তির দ্যুতি বিচ্ছুরিত হয়ে সে বাহ্যিক শান্তিকে স্বর্গীয় সুষমায় সুন্দর ও মনোময় করে তোলে। কবি জয়দেব এড়িয়ে না গিয়ে পেরিয়ে পেরিয়ে এমনই একটি পীঠস্থানে এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন যার সঙ্গে তুলনা করতে গেলে অশ্লীলতার বালাই আর থাকে না। আমার মনে হয় গীতগোবিন্দের বেলায়ও এ যুক্তিটি প্রযুজ্য। অবিশ্যি সমালোচনার অনেকটা স্থানই জুড়ে বসে রয়েছে মানুষের রুচিবোধ। কাজেই এ নিয়ে তর্কের মধ্যে যাওয়া নিছক পাগলামো বৈ কিছু নয়। মানুষের ভাব, কল্পনা ও তার অভিব্যক্তি বিভিন্ন ধরণের হবেই। তা নিয়ে কখনো তর্ক চলে না। তবে এ কথা সকলেই বলবে যে বাংলার এক নিভৃত পল্লীর ছায়া মেদুর বন-প্রচ্ছায়ে দাঁড়িয়ে কবি জয়দেব যে গীত ধারার অমৃত প্রস্রবণ দিকে দিকে প্রবাহিত করেছিলেন তারই শান্ত স্নিগ্ধ স্পর্শে বাঙালী-মন আজও এই অষ্ট শতাব্দী ধরে মধুর আবেশে নিমজ্জিত হয়ে রয়েছে। এ কথা বললেও অত্যুক্তি হবে না যে বাংলার গীতি কবিতার জনক জয়দেব। সে মধুর কাব্য কুঞ্জে মধুমক্ষিকার মত প্রাণ মাতানো কীর্ত্তন-কণ্ঠও তাঁর মাঝ থেকেই উৎসারিত হয়েছিল। বিশ্বের বিবেকি মানুষের অভিমত, কীর্ত্তনের মত এমন মন-হরণ সঙ্গীত জগতে আর মেলে না। কবি জয়দেব এই জন্যেই সভ্য দুনিয়ার অন্তরের সম্পদ। ইংলণ্ডে Edwin Arnold মন্ত্র-মুগ্ধের মত তাঁর ইংরেজী কবিতার সঙ্গে বাঙলার সেই পল্লীলক্ষ্মীর বরপুত্র জয়দেবের একটি পদ জুড়ে দিয়ে লিখেছিলেন—'মা কুরু মানিনি মানময়ে'।

এ থেকে এইটাই প্রমাণিত হয় যে, কবি জয়দেব শুধু আমাদেরই নয়, বিশ্বের আত্মার একজন ভাব-সাম্রাজ্যের সম্রাট। কবির গীতগোবিন্দের

অনুবাদ হয়েছিল জার্মান এবং ফ্রেন্স ভাষায়ও। ডক্‌টর শ্রীযুক্ত সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় কবি জয়দেব সম্বন্ধে বলেন—"গীতগোবিন্দ রচয়িতা কবি শ্রীজয়দেব সংস্কৃত সাহিত্যের অন্যতম প্রধান কবি এবং সংস্কৃত ভাষায় সর্ব্বাপেক্ষা মধুর গীতি কবিতার কবি বলিয়া তিনি সর্ব্ববাদী সম্মতিক্রমে সম্মানিত হইয়া আছেন। সংস্কৃত ভাষায় শ্রেষ্ঠ প্রাচীন কবিগণের নাম উল্লেখ করিতে হইলে সহজেই তাহার নাম আসিয়া পড়ে,—অশ্বঘোষ, ভাস, কালিদাস ভর্ত্তৃহরি, ভারবি, ভবভূতি, মাঘ, ক্ষেমেন্দ্র, বিহ্লন, শ্রীহর্ষ, জয়দেব। বাস্তবিক নিখিল ভারত ব্যাপিয়া যাহাদের যশ বিস্তৃত, সেই শ্রেণীর প্রধান সংস্কৃত কবিদের মধ্যে জয়দেবকে অন্তিম কবি বলিতে হয়। এক মহাকবি কালিদাসের ভারতব্যাপী প্রভাবের সঙ্গেই জয়দেবের প্রভাব তুলিত হইতে পারে। জয়দেবের গীতগোবিন্দ কাব্যখানি কবির পরবর্ত্তী কালের ভারতীয় সাহিত্যে অনেকখানি স্থান অধিকার করিয়া আছে।

মানুষের ধর্ম-জীবনের অনুপ্রেরণা আনিবার সৌভাগ্য ভারতের অল্প সংখ্যক কবির ভাগ্যে ঘটিয়াছিল। ব্যাস ও বাল্মীকি এবং কতকটা কালিদাস ভিন্ন আর কোনও কবি এই ভাবে সাহিত্যেতিহাসের দৃঢ় পার্থিব ভূমি হইতে পুরাণ-সুলভ কাহিনীর ও মধ্যযুগের ধর্ম সাধনার গগন-পথে উন্নীত হইতে পারেন নাই।

*　　　*　　　*　　　*

একান্ত মনোহর ও হৃদয়গ্রাহী ভাবে গীতগোবিন্দ কাব্যে দেব-কাহিনী ও প্রেমগাথা ভক্তি-মার্গের সাধনরূপে হিন্দু-সাংস্কৃতিক জাগরণের সেবায় মিলিত হয়। গীতগোবিন্দ রচনার শত বৎসর মধ্যে সুদূর গুজরাটে পাটনা বা অণহিলবাড়া নগরে প্রাপ্ত সংবৎ ১৩৪৮ তারিখের এক সংস্কৃত লেখকের মঙ্গলাচরণ শ্লোকরূপে ইহা হইতে একটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছিল। বাঙ্গালাদেশে ও উড়িষ্যায় যেমন, তেমনই গুজরাট ও

রাজপুতানায় এবং উত্তর পাঞ্জাবের গিরি দেশে ও উত্তর ভারতের বিশাল সমতল ভূভাগে সর্বত্র গীতগোবিন্দ জনপ্রিয় কাব্য হইয়া উঠে।"

(ভারতবর্ষ শ্রাবণ ১৩৫০)

গীতগোবিন্দ থেকে জানা যায়, কবির পিতার নাম ছিল ভোজদেব, মাতার নাম বামা দেবী এবং পত্নীর নাম ছিল পদ্মাবতী। তবে কেউ কেউ বলেন, কবির পত্নীর নাম ছিল রোহিণী। এ কথা বলবার সূত্র খুঁজলে দেখা যায়—

"কেন্দুবিল্ব সমুদ্র সম্ভব রোহিণী-রমণ।"

অন্যত্র দেখা যায়—

"জয়তি পদ্মাবতী-রমণ জয়দেব কবি।"

আবার কেউ কেউ এ কথাও বলেন যে, পদ্মাবতীরই অপর নাম রোহিণী। কিন্তু সহজিয়াগণ রোহিণীকে ধরেছেন কবির পরকীয়া হিসেবে।

"জয়দেব মহা কবি জগতে পূজিত।
কৃষ্ণলীলা রস আদি বসেতে ভূষিত॥
পদ্মাবতী সহোদরা রোহিণী নামেতে।
তারে গুরু কৈল (গোসাঞী) রস আস্বাদিতে॥
তার বাক্য অনুসারে সেই সব জানি।
নহিলে জানিব কোথা অতি ক্ষুদ্র প্রাণী॥

তথাপি—'কেন্দুবিল্ব সমুদ্র-সম্ভব-রোহিণী রমণেন—'

"কেন্দুবিল্ব গ্রাম আমার সমুদ্র সমানা।
সমুদ্র সম্ভব চন্দ্র তৈছে সম জানা॥
রোহিণী নামেতে হয় চন্দ্রের বণিতা।
রোহিণী-রমণ আমি হই গুপ্ত কথা॥"

(বীরভূম দেয়াশ গ্রামের 'ক্ষ্যাপা মায়ের' আখড়ায় প্রাপ্ত খণ্ডিত পুঁথি)।

জয়দেবের গীতগোবিন্দ নিয়ে কত লোকে কত কি বললে। কেউ বললে, গীতগোবিন্দে কতগুলি অনুপ্রাস আর শব্দালঙ্কারের বাহুল্য। এই উক্তির মধ্য দিয়ে বক্তাদের একটা প্রজ্ঞাজনোচিত অবজ্ঞার ভাবই পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। কিন্তু তাঁদের ভুলে গেলে চলবে না যে—কবির গীতগোবিন্দ নিয়মের রাজ্যের চিরাচরিত ধারার ধরণ নয়। কালীদাসের মেঘদূতের মত জয়দেবের গীতগোবিন্দও মৌলিক উপাদানে বিশ্বের বিস্ময় হয়ে রয়েছে। সুর, লয়, তান, মান ও গানে গীতি-কবিতা হিসেবে এমন উদাহরণ প্রাচীন সাহিত্যে আর কোথাও মেলে? সমালোচকদের তরীতে উঠে কবি যতই ডরার জল খান না কেন প্রাচীন বৈষ্ণব কবিদের অন্তরের কোন্ অতল গহনে জয়দেব তাঁর প্রসাদ-গুণে যে আসন প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তারই একটি উদাহরণ তুলে ধরছি—

জয় জয় জয় দেব দয়াময়
পিরিতি রতন খনি।
পরম পণ্ডিত পূজ্য গুণগণ
মণ্ডিত চতুর মণি॥

* * * *

পদ্মাবতী সহ গানে বিচক্ষণ
আনে কি উপমা সাজে।
পশু পক্ষ ঝুরে শুনিয়া গন্ধর্ব
কিন্নর মরয়ে লাজে॥—(নরহরি দাস)

কবি-পত্নী পদ্মাবতী সম্বন্ধেও অনেক গল্প আছে। তিনিও ছিলেন সঙ্গীত সাধনায় অদ্ভুত প্রতিভাশালী। এ প্রমাণ পাই আমরা 'সেক শুভোদয়া' থেকে। বোধহয় 'সেক শুভোদয়া' লেখা হয়েছিল পঞ্চদশ শতাব্দীতে। তার মধ্য থেকে একটি গল্প বলছি।

লক্ষ্মণ সেনের রাজসভা। আমলা কর্মচারী পরিবেষ্টিত রাজা। উপবিষ্ট আসনে। সহসা সেখানে এসে প্রবেশ করলেন দিগ্বিজয়ী গায়ক বুঢ়ন মিশ্র। বললেন রাজাকে লিখে দিতে জয়পত্র। কিন্তু জয়দেব ও তাঁর পত্নী পদ্মাবতী এসে বুঢ়ন মিশ্রের গর্বোদ্ধত মস্তক অবনমিত করে দিলেন। পরাস্ত হলেন তিনি। নত মস্তকে স্বীকার করে গেলেন জয়দেব ও পদ্মাবতীকে শ্রেষ্ঠ বলে দিগ্বিজয়ী গায়ক বুঢ়ন মিশ্র।

পদ্মাবতীর জন্ম সম্বন্ধে প্রবাদ বাক্য আছে। তা হলো এই যে—দক্ষিণ দেশের এক ব্রাহ্মণ দম্পতী পুরুষোত্তমে এসে শ্রীজগন্নাথ দেবের কাছে জানালেন অন্তরের অকুণ্ঠ মিনতি। কি সে মিনতি? আমাদের সন্তান দাও ঠাকুর। ছেলে হলে তোমার সেবক করব তাকে। অর্পণ করব। মেয়ে হলে সে হবে তোমারই সেবিকা। এ আকুল প্রার্থনার দ্বাদশ বছর অন্তে ব্রাহ্মণীর ঘরে একটি কন্যা এলো। জগন্নাথ দেবের পাদপদ্মে অর্পণ করবার মানসে তাকে নিয়ে ব্রাহ্মণী চলে এলেন পুরীধামে। ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলো। স্বপ্নাদেশ করলেন নীলাচলনাথ। কি? ফিরে যাও তোমরা কেন্দুবিল্ব গ্রামে। দেখগে সেখানে, দেখগে ভক্ত জয়দেব বলে সেখানে এক কবি আছে। সে আমারই অংশস্বরূপ। তার হাতে মনের আনন্দে অর্পণ কর গিয়ে তোমাদের কন্যাকে। সে দান গ্রহণ করব আমিই। লিখেছেন বনমালী দাস—

> "তাহারে দেখিয়া মনে ঘৃণা না করিবে।
> যেমত আমাকে জান তেমতি জানিবে॥"

ব্রাহ্মণীর আনন্দের আর সীমা কি? তিনি চলে এলেন কেন্দুবিল্বে। এবং জয়দেবের সঙ্গে বিয়ে দিলেন পদ্মাবতীর।

নিশি অবসানে জয়দেব ঘুম থেকে উঠে শ্রীরাধা-গোবিন্দের পূজার ফুল আহরণ করতে যেতেন—

> "রাত্রি শেষে উঠি মঙ্গল আরতি করিয়া।
> প্রাতঃকালে সুকুসুম আনেন তুলিয়া॥

তখন পদ্মাবতী কি করতেন ?

পদ্মাবতী নানা রঙ্গে গাঁথে ফুলহার।
গীতগোবিন্দ রচে প্রভু কৃষ্ণলীলা সার।

* * * *

প্রহরেক পর্য্যন্ত যায় গ্রন্থের বর্ণনে।
তার পর গঙ্গাতীরে যান গঙ্গা স্নানে॥"

স্নান সমাপনান্তে ভোগের প্রসাদ গ্রহণ করে গীতগোবিন্দ লিখতে বসতেন। এবং অন্তরের সমস্ত মাধুরী দিয়ে সীমার মাঝে অসীমের সাধনায় কবি ধীরে ধীরে ভাব-সায়রে নিমজ্জিত হতেন। এমনি করে লেখা হয়ে গেল 'স্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং'। কিন্তু আর তো লেখনা চলে না। সহসা যেন ভাবরাজ্যের দ্বার রুদ্ধ হয়ে গেল। কবির কাব্য-কুঞ্জে যে কোকিল ডেকে এতক্ষণ কথা কইল সে যেন কোথায় কোন অদৃশ্যের মেঘছায়ায় অপসৃত হলো। একটানা স্রোতমুখে বাঁধ পড়ল। কবি চললেন গঙ্গাস্নানে। কি লিখবেন তিনি? এ যে বিষম দায়! কারণ—

"কৃষ্ণ চাহে পাদপদ্ম মস্তকে ধরিতে
কেমনে লিখিব ইহা বিস্ময় এই চিতে॥"—(নরহরি দাস)

কিন্তু আকুল ভক্তের ব্যাকুল আহ্বানে ভগবান এলেন ভক্ত জয়দেব বেশে ঘরে। কেউ চিনল না তাঁকে। তিনি স্বহস্তে রুদ্ধদ্বারের কপাট খুলে ভাবের তরঙ্গ তুলে অদৃশ্য হলেন। খণ্ডিত ছত্রের পাদ পূরণ করে গেলেন এই বলে—

"দেহি পদ পল্লবমুদারম্।"

শুধু তাই নয়—পদ্মাবতীর অন্তরে যাতে না ভ্রান্তির ছায়া পরে তার জন্যে জয়দেবরূপী ভগবান জয়দেবের মতই চিরাচরিত কার্য সমাপনান্তে আহার করলেন। এবং শুতে গেলেন। বিশ্রামাগারে গিয়ে শয়ন

করলেন। পদ্মাবতী অনেকক্ষণ ধরে প্রভুর পাদ সংবাহন করলেন। তারপর চলে এলেন রন্ধনশালায়। বসলেন প্রসাদের অন্ন আহার করতে। এমনি সময় কবি জয়দেব গঙ্গা স্নান করে ঘরে এলেন। পদ্মাবতীর বিস্ময়ের সীমা নেই। অপলক নেত্রে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকেন পদ্মাবতী, তাকিয়ে থাকেন প্রভুর পানে। ক্রমে সব রহস্যের যবনিকা উত্তোলিত হলো। তখন—

"এক চিত্তে গ্রন্থপাত খুলিলা ঠাকুর।
অর্দ্ধ কলি ছিল পদ হইয়াছে পূর॥
অর্দ্ধ কলি কৈলা পদ জয়দেব সার।
কৃষ্ণ হস্তে দেখি পদপল্লব মুদার॥
পাদপূর্ণ দেখি মনে হইলা প্রত্যয়।
কৃষ্ণ পূর্ণ কৈলা মোর মনের আশয়॥
শয়নে আছেন প্রভু মনে অভিপ্রায়।
মন্দির ভিতর শীঘ্র দেখিবারে যায়॥
কৃষ্ণ অঙ্গ পরিমলে পালঙ্ক পূরিল।
মনোহর সুগন্ধেতে নাসিকা মাতিল॥
শয়নের চিহ্ন সব দেখিল শয্যাতে।
শয্যামাত্র আছে কৃষ্ণ না পায় দেখিতে॥"

এ সব কিম্বদন্তী থেকে আমরা কি পাই? পাই কবি জয়দেবের হৃদয় ধর্মের একটি অপূর্ব পরিচয়। কবি ভাবে রাগে রসে একেবারে ভরপুর ছিলেন। এ জাতীয় ভক্ত-কবি বাঙলার পেলব স্নিগ্ধ মৃত্তিকায়ই শোভা পায়। সত্যি কথা বলতে কি, এমন রূপ ও রসের সমন্বয়ে বাঙালী কবিই তার অমর কাব্য রচনা করতে সক্ষম। বাঙালী প্রতিভা প্রাণের গভীরে একটি অদৃশ্য রেখা অঙ্কিত করে এমন স্তরে নিয়ে যায়, যার ব্যাখ্যা করতে গেলে শুধু এই কথাই বলা চলে যে, এ রেখা রেখা নয়

শুধু শিখা। এবং সেই শিখার আলোর আলোকিত করে দেয় জীবনের জড়তাকে। সেখানে শুধু মমতার মাধুরী। প্রাণের অশ্রান্ত প্রবাহ। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও জয়দেবের গীতগোবিন্দের অনুরাগী ছিলেন।

বাঙলার কবি-প্রতিভা গীতি-ধর্মী। এই গীতিমুখি রসমাধুর্যে অবগাহন করেছে গ্রীক সাহিত্য। জার্মান কবি হায়েনের মধ্যেও এ রসের প্রবাহ প্রবাহিত হয়েছিল। শেলীও বঞ্চিত হয়নি এ রস থেকে। কিন্তু তাদের এই মিলিত উৎস সঙ্গমে বাঙালীর কাব্য-প্রতিভা বিলাস করেছে লীলাময়ের মত। এইখানেই বাঙালী প্রতিভার স্বাতন্ত্র্য এবং স্বকীয়তা।

কাব্যের রস নিয়ে আলোচনা করলে আদি রস বা মধুর রসই মুখ্য বলে ধরে নেয়া যায়। বৈষ্ণব আলঙ্কারিকদের তো এই মত। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ এই আদি রসেরই মূর্তিমান বিগ্রহ। পূজারী গোস্বামী বলেন—রস দশটি। এবং সেই দশটি রসের দশ অবতার। তার মধ্যে যিনি সর্ব রস সার তিনিই হলেন শ্রীকৃষ্ণ। রসের নাগর। রসরঞ্জন। কবি জয়দেব এই মধুর রস এমন সুন্দরভাবে পরিবেশন করেছেন, যার আস্বাদ-তুল্য রসসম্পুট আর একখানা দুর্লভ বললেও অত্যুক্তি হবে না। মূর্তিমান শৃঙ্গার রসরূপে কল্পনা করেছেন তিনি ভগবানকে। এবং সেই কল্পনার প্রবাহই তার কাব্য সাধনার মূল উৎস। সেখান থেকে যাত্রা করে উপনীত হলেন তিনি 'দেহিপদপল্লব মুদারম্' এর স্তরে। এখানে সবই তুনিময় হয়ে গেল। কর্তা ও কর্মের মিলনের মাঝ দিয়ে ফুটে উঠল বিশ্বের বিস্ময় নিকুঞ্জে স্বর্গের একটি পারিজাত। সেখানে দাম্পত্য-প্রেমের সার্থক পরিণতি ঘটল ভগবৎ প্রেমে। অজয়ের বুকে বেজে উঠল কালিন্দীর কলস্বান। কেন্দুবিল্ব রূপান্তরিত হলো বৃন্দাবনে। আর জয়দেব পদাবলীর শ্রবণ মনন সুর লহমা কানে এলো বেণুধ্বনির মতই। নয়নে আসে জল। বুকে বাজে ব্যথা। দৃষ্টির দুয়ারে আভাসিত হয় স্রষ্টার

অপূর্ব সৃষ্টি। আর তারই কুঞ্জে কুঞ্জে কে যেন মমতামধুর কণ্ঠে গেয়ে চলে—

"* * নন্দনি দেশতশ্চলিতয়োঃ প্রত্যধ্বকুঞ্জদ্রুমং
রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি যমুনাকূলে রহঃ কে লয়ঃ"

এ সুর-সুধায় জীবনের প্রদোষ-লগন থেকে অপসৃত হয়ে যায় অন্ধকার। জড়তার পাষাণ ফলকে প্রকীর্ণ হয় জ্যোতিচ্ছটা। আর সেই দ্যুতি বিচ্ছুরণের মাঝ দিয়ে মনোগেহের গান জাগে থেকে থেকে। সে সঙ্গীত, সে সুর হৃদয়ের অন্তঃপুরে অনন্তের অভিসার আয়োজনে আনন্দময়ের অর্চনায় রত।

চণ্ডীদাসের রামী

পল্লী-বাঙলার মৃৎকোষে প্রাণিত হয়ে রয়েছে ভক্ত সাধকের অন্তর নির্যাসের সুর-লালিত্য। সে সুর পদমাধুর্যে প্রাণ হরণের গান গেয়ে গেয়ে স্বর্গমর্ত্তের মধ্যে বেঁধে দিয়েছে একটা মহাঐক্যের মিলনী সেতু। এ যোগাযোগ যেন জন্মজন্মান্তরের। হৃদয় দিয়ে হৃদি হরণের এমন মধুর পথ আর কে কোথায় কবে আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন জানি না। আর তা জানি না বলেই বাঙলার বৃন্দাবন প্রেমের অমরা সেই মানুষের শ্যাম-অঙ্কে বারে বারে ধেয়ে যায় মন প্রেমিক জনের অশ্রুসিক্ত মৃত্তিকার স্পর্শ অভিলাষে।

প্রেমের পথে ব্যথার বান্ বাজিয়ে বাঙলার বৈষ্ণব কবিগণ তাঁদের অন্তরের তৃষ্ণা মিটিয়েছিলেন। সে প্রেম যেমন ছিল নিষ্কাম মাধুর্যে নিকষিত হেম, তেমনি ছিল তার এমন একটি ভাব-মহিমা যার প্রভাবে হৃদয়ের সমস্ত চাওয়া-পাওয়ার কান্নাকে ঐ এক উৎসে প্রবাহিত করে দিতে তাঁরা পেরেছিলেন। হৃদয়াবেগ অপূর্ব। উজ্জ্বল। বাঙলার পদাবলী সাহিত্য পর্যালোচনা করলে দেখতে পাই তা যেন সাহিত্য-সংজ্ঞাকে অতিক্রান্ত করে কোন্ এক অসীমের লীলা পথে অনন্তের মহালোক-পানে ছুটে চলেছে। সেখানে ঐশ্বর্য্য নেই, আছে ঐকান্তিকতা। কামনা নেই, আছে ভালোবাসা। লাজ, মান, ভয় সব কিছুই নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছে। জেগে আছে শুধু অন্তর। আর অবিরলধারে হৃদ্-যমুনার অশ্রান্ত প্রবাহ নয়ন-পথে নির্গত হয়ে তাপিত বক্ষের জ্বালা জুড়িয়ে দিচ্ছে।

আলোচ্য কবি সম্বন্ধে অনেক যুক্তিতর্কের অবতারণা করেছেন পণ্ডিতগণ। হয়ত তার সত্যাসত্যও অভ্রান্ত। কিন্তু আমার এ কাজ নয়। আমার কাছে চণ্ডীদাস এক এবং অভিন্ন। তিনি কবি। প্রেম বিগ্রহের ঘনীভূত জ্যোতি। তর্কের তুফানে আসল বস্তুকে তলিয়ে দিয়ে তার্কিক হবার জ্ঞান-গরিমা আমার নেই। আমার সম্বল হলো এক বিন্দু নয়নের জল। সেই অশ্রু উৎসের সন্ধান করতে করতে গিয়ে দাঁড়াব হৃদ্‌উদধির তটভাগে। সেখানে চণ্ডীদাস এক বৈ দ্বিতীয় নেই। যাঁর পদমাধুরীমার প্লাবনে প্রকীর্ণ হয়েছিল প্রাসঙ্গ জোছনার প্রশান্ত দ্যুতি, আজ আমি সেই পদকর্তা রামা-রমণ চণ্ডীদাস সম্বন্ধে আলোচনা করব।

প্রায় পাঁচ শত বছরের অতীত ইতিহাস। কবি চণ্ডীদাস আবির্ভূত হয়েছিলেন শ্যামল বাঙলার অমল উৎসঙ্গে। এ প্রমাণ বহুজন-স্বীকৃত। চৈতন্য-চরিতামৃত থেকে আরম্ভ করে বহু গ্রন্থই এ সাক্ষ্য বহন করছে। তাছাড়া অনেক পদকর্তার পদও এ সত্য অকুণ্ঠিত ভাবে সমর্থন করেছেন। মহাপ্রভুর কীর্তন-কণ্ঠ চণ্ডীদাসের পদ-মহিমায় উঠেছিল ধ্বনি-মধুর হয়ে। আঁখিলোরে ভেসে ভেসে মহাপ্রভু গাইতেন কবির প্রাণ নির্যাসের অশ্রু-স্নাত পদগুলি। আর বুঝি বা স্মরণ করতেন কবিকে। মহাপ্রভুর আগেই কবির তিরোধান হয়েছিল। ছিলেন বিদ্যাপতি। দীর্ঘায়ু হয়েছিলেন তিনি। তাঁর জীবন-গ্রন্থের পাতাগুলো উল্‌টিয়ে গেলে বহু ঘটনার তারিখও পাওয়া যেতে পারে, অথবা পাওয়া গেছে। এবং তা পাওয়া গেছে বলেই চণ্ডীদাস সম্বন্ধে একটা স্থির সিদ্ধান্তে আমরা পৌঁছতে পেরেছি।

জয়দেব-চণ্ডীদাসের জন্মভূমি বীরভূম। এই বীরভূমের অন্তর্গত নান্নুরে কবি চণ্ডীদাস আবির্ভূত হয়েছিলেন। চণ্ডীদাসের পিতা ছিলেন বাশুলী দেবীর ভক্ত। আজও নান্নুরে বাশুলী দেবীর মন্দির বর্তমান। পিতার

মৃত্যুর পরে মন্দিরের সমস্ত সেবা ও পূজার ভার চণ্ডীদাসকে গ্রহণ করতে হলো। ধীরে ধীরে তিনি দেবীর একান্ত কাছের হয়ে উঠলেন। অন্তরের অর্ঘ দিয়ে দেবীর আরাধনা চলল। একদিন ঘটল এক অলৌকিক ব্যাপার।

কি ?

কাঁচা সোনার রোদ্দুরে ভরে গিয়েছে আকাশ মাটি। সকাল। পাখীদের কণ্ঠে প্রভাতের বন্দনা। বাতাসে ঘন নিঃস্বন। নদী বইছে চুপি চুপি। সে যে আসে ··· আসে······আসে ···।

কে আসে ?

চণ্ডীঠাকুরের আরাধনার ধন। তাঁর হৃদ্‌পদ্মের শতদলে প্রকীর্ণ হয়েছে এক অপূর্ব জ্যোতি। চণ্ডীদাস দেখলেন—দেখলেন, বাশুলী মন্দিরে স্বর্ণ-স্তম্ভের অন্তরালে এক সোনার পুতুল। সে দৃষ্টি-দুয়ার ভেঙে বেরিয়ে এলো অন্তরের সমুদ্র উচ্ছ্বাস। আকুল হয়ে পড়লেন ঠাকুর।

কেন ?

তিনি যে রামীর প্রেমে পাগল। রামী-ধ্যান, রামী-জ্ঞান। রামী বৈ যেন জগতে আর কোন কিছুই তাঁর কাছে বড় নয়। বড় ব্যথা পেলেন কবি। ডুকরে কেঁদে উঠলেন। জানালেন আকুল মনের বিলাপ। চললেন চণ্ডীদাস, চললেন দেবী সমীপে—"আমি বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ বংশে জন্মিয়াছি, আমি কত তপস্যা দ্বারা তোমার পূজা করিয়া থাকি, আমার একি হইল, তোমার অপেক্ষা রামী আমার নিকট সত্য হইল ? আমি পতিত হইয়াছি, আমি কি করিব বলিয়া দাও।"

দেবী প্রসন্না হলেন। ভক্তের অন্তরের সরল প্রশ্নের জবাব দিলেন—"তুমি ইন্দ্রিয়জিৎ হইয়া এই নারীকে ভালবাস, ইনি তোমার হৃদয়কে যে পবিত্রতা দিবেন, ব্রহ্মা, বিষ্ণু কিংবা আমিও তোমাকে তাহা দিতে পারিব না।"

এর চেয়ে বড় সত্য আর কি আছে? প্রেমের যে পবিত্রতা ও মাধুর্য তা একটি জীবনকে দীনতার অন্ধকার থেকে নিয়ে যেতে পারে আলোর তীর্থে। কিন্তু প্রশ্ন উঠবে এ কেমন প্রেম? প্রেম বলে কাকে?

প্রেমের সোজাসুজি অর্থ হচ্ছে প্রিয়-প্রাণ ব্যাকুলতা। সবচেয়ে আপনার বলে যাকে জানি, তার জন্যে আকুলতা। এই আকুলতার পথ ধরেই জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিলন সাধিত হয়ে থাকে। মানুষ মানুষকে ভালোবাসে। সে ভালোবাসার মধ্যে যদি সত্যই প্রগাঢ় ব্যাকুলতা থাকে তবে অভীষ্টসিদ্ধির পথে ঐ দুয়ার দিয়েই চলে যাওয়া যায়।

নর ও নারী, পুরুষ ও প্রকৃতি, এদের যে মিলন, এই মিলনের মাঝেও নিদ্রিত থাকে স্বর্গ-মর্ত্য। কথাটা আর একটু সোজা করে বলি—যাকে কেন্দ্র করে জীবনের বাসর সাজাই, তিনি কে?

কার জন্যে চুপি চুপি একান্তে বসে মালা গাঁথি? তিনি আমার সব চেয়ে আপনার জন। আমার পরমাত্মীয়। তাঁকে হৃদয় উজাড় করে দিয়েও যেন শান্তি পাচ্ছি না। ঐ দেহে নিজেকে মিলিয়ে দিতে পারলে বুঝি জ্বালা জুড়াত।

আমার মনের ছবি, আমার প্রাণের গান সব দিয়ে যেন তার দেহ-ব্রহ্মাণ্ড রচিত হয়েছে, একবার দেখলে আর তো পলক পড়ে না। একবারের অদর্শনে প্রাণ ফেটে যায়। এই যে ব্যথা, কান্না ও আর্তি এ কিসের ইঙ্গিত সূচিত করে?

মিলনের।

মিলনের বাসনা-বিলোল-মন আর যেন কিছু চায় না। শুধু তার ভালোবাসার জনকে পেলেই সে শান্ত। আর যদি তাকে না পাওয়া যায়? তবে তো তার চোখের ধারা কোন দিন থামবে না। এ কান্নারও পরিসমাপ্তি হবে না।

এ আর্তি শুধু ভাব-ব্যঞ্জনার কল্পলোক রচনার আর্তি নয়, এর মাঝেই প্রেম-সরসীর অতলের কথাটি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। মানুষকে ভালোবাসতে হবে। ভালোবাসতে হবে বিশ্ব-স্রষ্টার সৃজিত ও আশ্রিত জীবকে। কিন্তু সে প্রেম কখন সম্ভব ?

যখন আত্মার আকাশে বিশ্ব-বিবেকের বাণী নিয়ত ধ্বনি-মধুর হয়ে ওঠে।

কিন্তু সে তো সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। চাই সাধনা, তিতিক্ষা ও প্রেম।

অবশ্য অনেক সাধক-সন্ত জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিলনের কথা বলেছেন নানা ভাবে। পথও দেখিয়ে গেছেন অনেক। কিন্তু রামীর চণ্ডীদাসের পথটি ভিন্ন। এ পথে ত্যাগ আছে। আছে তিতিক্ষা ও সংযম। কিন্তু তা এড়িয়ে নয়—মাড়িয়ে। চোখ বুজে জগতের সর্ব বস্তুকে আড়ালে রেখে নয়, চোখ মেলে দেখে শুনে তার পরে অভিসারে যেতে হবে।

জলে নাম, স্নান কর। কিন্তু জল যেন লাগে না গায়ে। এই জন্যেই—

"চণ্ডীদাস-প্রেম
নিকষিত হেম
কামগন্ধ নাহি তায়—"

মানুষের পৃথিবীতে স্বর্গের সুধা ঢেলে সেই সুধা-সরসীতে রামীরূপ রমনীকে লয়ে মন-রমণে ভাসতে পারলে কামগন্ধহীন প্রেমের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে।

চণ্ডীদাস ও রামী। রামী বৈ চণ্ডীদাস বাঁচে না। তাঁর অন্তরাত্মা রামী-বিরহে বিদীর্ণ হয়ে যেতে চায়। সমাজ সংসার সব যেন রামী বিহনে মিথ্যা বলে মনে হয়। জীবনের উপর আসে বিস্বাদ। এই রামী কে ?

চণ্ডীদাসের ভাষায়—

"তুমি হও পিতৃ মাতৃ
তুমি বেদমাতা গায়ত্রী
তুমি সে মন্ত্র, তুমি সে তন্ত্র
তুমি উপাসনা রস।"

ধোবানী রামীর শ্রীচরণ উদ্দেশ্যে এই যে প্রসূন-সম্ভার এ তো শুধু মর্ত্যের সীমায়ই সীমিত নেই। চণ্ডীদাসের এই মানুষী প্রেম ভাবের প্লাবনে সীমাতীত সেই অসীমের তীর্থলোকে পৌঁছে যেতে পেরেছে। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতার কয়েক ছত্র তুলে ধরছি—

"এই প্রেম-গীতি-হার
গাঁথা হয় নর নারী মিলন মেলায়,
কেহ দেয় তাঁরে, কেহ বঁধূর গলায়।
দেবতারে যাহা দিতে পারি, দিই তাই
প্রিয়জনে—প্রিয়জনে যাহা দিতে পাই,
তাই দিই দেবতারে ; আর পাব কোথা?
দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়রে দেবতা।"

বৈষ্ণব কবিতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মতামত এই কবিতাটির মধ্যে অনেকটা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়ে রয়েছে। 'দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়রে দেবতা'—চণ্ডীদাসের রামী সম্বন্ধে এ উক্তিটি প্রযুজ্য। প্রিয়রে দেবতা করে দেবতার দেবত্ব আরোপ করা হয়েছে প্রিয়র মাঝে। এখানে প্রিয় হয়ে উঠেছে প্রেম রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। মানুষী প্রেমের সীমা লঙ্ঘন করে স্বর্গীয় প্রেমের প্রভা প্রকীর্ণ হয়েছে এর সর্বত্র। এখানে সঙ্কীর্ণতা নেই; নেই আড়ষ্ট চেতনার ভীতি-বিহ্বল ভাব। শুধু তুমি আর আমি। 'দুঁহু কোলে দুঁহু—'

ভেদ নেই। বিভেদ নেই। আছে মিলনের একটা তীব্র আকুলতা।

একথা একজন প্রেমিকের কানে কানে রাখলে তিনি তার মর্ম, মর্ম দিয়েই উপলব্ধি করতে পারবেন। সাধারণ মানুষের দুর্ভাগ্য। তারা এ প্রেমের সায়র-কূলে দাঁড়িয়ে শুধু নিন্দাই করল, পেলনা থই। কটাক্ষ করল কিন্তু ঝরলনা এক ফোঁটাও চোখের জল।

চণ্ডীদাসের অদৃষ্টেও তার বেশী জুটল না। রজকিনীর কলঙ্কে কলঙ্কিত কবি হলেন সমাজচ্যুত। জ্ঞাতি-পরিজনরা এসে বলতে লাগলেন কত কথা—

"শুন শুন চণ্ডীদাস—
তোমার লাগিয়া আমরা সকল ক্রিয়াকাণ্ডে সর্বনাশ॥
তোমার পিরীতে আমরা পতিত, নকুল ডাকিয়া বলে।
ঘরে ঘরে সব কুটুম্ব ভোজন করিঞা উঠাব কুলে॥"

কবি-ভ্রাতা নকুল হলেন একাজে অগ্রণী। তিনি পতিত চণ্ডীদাসকে জাতে তুলবার জন্যে করতে লাগলেন চেষ্টা। কিন্তু গ্রাম থেকে গ্রাম-বাসিগণ চণ্ডীদাসের নিন্দায় উঠলেন মুখর হয়ে। বললেন,—

"নীচ প্রেমে উন্মাদ।"

কিন্তু প্রেমের যে উচ্চ-নীচ, অধম-উত্তম নেই একথা একবারও তাঁরা ভাবলেন না। ফুল ফুলই। তার পবিত্রতা হরণ করে কার সাধ্য? সে আস্তাকুঁড়ে ফুটেও দেবতার পদতীর্থ আর প্রিয়জনের কণ্ঠ অবধি যাবার দাবী রাখে। তেমনি চণ্ডীদাস গ্রামের চোখে আস্তাকুঁড়ের ফুল হলেও সে দেবভোগ্য। একথার প্রমাণ পরবর্তীকালে স্বয়ং মহাপ্রভু দিয়ে গেছেন। চণ্ডীদাসের গান গাইতে গাইতে তাঁর দেহে স্ফুরিত হত ভাব-লক্ষণ। চোখে নামত হৃদ্-যমুনার ধারা। যাক সে কথা। গ্রামের লোক আরো বললেন—

"পুত্র পরিবার,
আছয়ে সংসার—
তাহারা সম্মতি নহে॥"

বলিয়া উপেক্ষা ও অবহেলায় চণ্ডীদাসকে একধার করে রাখালেন। কিন্তু নকুল বদ্ধপরিকর, ভাইকে তিনি পুনঃ প্রতিষ্ঠা দেবেনই।

নকুলঠাকুরের ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে অবশেষে তাঁরা এলেন—এলেন নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতে। বললেন নকুলকে—

"তুমি একজন
বট মহাজন
সকল করিতে পার—"

রামী তখন এসব কথাই শুনলেন। অশ্রুস্তিমিত চোখে ঘরে ফিরলেন রামী। তাঁর জীবনের সবই যেন নিঃশেষ হয়ে গেল। তার বলতে কি রইল আর?

"নয়নের জলে
কান্দিয়া বিকল
মনে বোধ দিতে নারে।"

তার পরে আহত পাখীর মত প্রাণ-প্রিয় প্রভুর বিরহে ভগ্নমন লয়ে—

"গৃহকে জাইঞা
পালঙ্ক পড়িয়া
শয়ন করিল তায়।
কান্দিয়া মুছিছে
নিশ্বাস রাখিছে
পৃথিবী ভিজিয়া যায়।"

মানুষ সব দুঃখ সব বেদনাকেই নীরবে চোখের জল ফেলে সয়ে যায়। কিন্তু এই বিরহ-বেদনার দহন সহ্য করা যায় না। এ যেন নিয়তই নিবিড়ভাবে জীবন-মন-তনু-প্রাণকে একমুখো করে রাখে। সে প্রবোধ মানে না। জাত-কুল-মানের বালাই নেই। এক সত্য

এক দীপ তার অন্তর আকাশে দেদীপ্যমান হয়ে ওঠে—আমার সবই তো তুমি। তুমি বিহনে জীবন মিথ্যা। যৌবন ভ্রান্ত। সকলই যে প্রারব্ধ আঁধারের বিকৃত হাসি। তুমি যেও না। না, না, যেও না।

রামীর হৃদ-মণুরায়ও তখন এই বিরহের বাঁশী বাজছিল। তিনি উদ্‌ভ্রান্তের মত আলুথালু বেশে বকুলতলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অশ্রু বিসর্জন করতে লাগলেন।

এ প্রেমবারি স্বর্গের মন্দাকিনীর মতই মধুর ও পবিত্র। এ কান্নার কণ্ঠ মর্ত হইতে স্বর্গের দেবতার আসনকেও টলিয়ে দিতে সক্ষম। পৃথিবীর প্রেম বৈ তাঁর খেলা জমবে কেমন করে? লীলাখেলায় নামতে হলে আমায় ছাড়া তাঁর চলবে না। এই আত্ম-প্রত্যয় মিথ্যা নয়। প্রেমিকজন জানে প্রেমের জ্বালা। সেখানে কাম-গন্ধ থাকে না। কেবল দর্শনেই শান্তি। পেলেই মন যেন শান্ত হয়ে যায়। নীরবে মুখোমুখী বসে নির্বাক পলগুলোর সঙ্গে একটা ঐক্য স্থাপিত ক'রে একজন অপরজনকে শুধু দেখেই তৃপ্তি পায়। আর কিছুই থাকে না তার চাহিদা। তখন যে আপ্‌সেই বাক রুদ্ধ হয়ে আসে। কেন আসে তা বলা ভার। একটা অবাচ্য অনুভূতি দেহ-মনকে পবিত্র ও রোমাঞ্চিত করে দেয়।

রামী আর পারলেন না নিজেকে ধরে রাখতে। এদিকে ব্রাহ্মণ ভোজনের আয়োজন সমাপন হয়েছে। কত মিষ্টি-মণ্ডার ঘটা। সকলে আহারে বসেছেন। এবারে হবেন ভোজনে প্রবৃত্ত। ঠিক তখন, তখনই রজকিনী রামী সেখানে এসে হাজির হলেন।

"দ্বিজগণ ডাকে
ব্যঞ্জন আনিতে
ধোবানী তখন ধায়।"

উন্মাদিনী রামী একবার চিন্তা করলেন না কি হবে, কি হতে পারে। করুণাপূর্ণ বিষাদঘন মুখে রামী বিরহিণী-রাইবেশে সেখানে গিয়ে দাঁড়ালেন।

এই মানব-প্রেমকে নিছক মোহ বাসনার রং-এ রঞ্জিত করে উড়িয়ে দিলে চলবে না। এই প্রেমই একদা দেহ থেকে দেহাতীতের সন্ধানে, অন্তরের অর্চনায় আত্মোৎসর্গ করতে সক্ষম হয়। রামী-চণ্ডীদাসের প্রেম, চিন্তা ও বিল্বমঙ্গলের প্রেম, জয়দেব-পদ্মাবতীর প্রেম এবং মালিনীর সঙ্গে অভিরামের প্রেম একই পর্যায়ভুক্ত বলা যেতে পারে।

বাঙলার প্রেমসাধকদের এক একটি অন্তর যেন এক একটি বৃন্দাবন ও মথুরা। সেখানে যে লীলাবিলাস আমরা প্রত্যক্ষ করলাম তা কম কি? এ উৎস-মূলের পরিণতি ও বিস্তৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করলে দেখতে পাই কি?

দেখতে পাই একটা মহান শক্তির বিকাশ এ সকল কেন্দ্রবিন্দু থেকে উৎসারিত হয়ে আনন্দলোকের সন্ধান দিতে সক্ষম হয়েছে।

যথা, রামীকে সম্মুখে রেখে চণ্ডীদাস যে বিরহ-বেদনার গান গাইলেন তা রূপান্তরিত হলো রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলায়। এ স্তরে এসে মন যখন আরূঢ় হয় তখন দ্বৈত আর অদ্বৈতের বিভ্রান্তিকর বিভ্রাট মোটেই থাকে না। দুই মিলে তখন এক অচিন্ত্যপূর্বরূপ পরিগ্রহ ক'রে জ্যোতিচ্ছটা বিকিরিত করে দেয়। যাকে কেন্দ্র করে জীবনের গান গাওয়া সুরু হলো সে তখন নিমিত্ত বৈ তো আর কিছু নয়। কিন্তু এই নিমিত্তকে কেন্দ্র করেই নিত্যের খোঁজে নিত্যানন্দের সন্ধান মেলে। মানবীপ্রেমের সরোবরে ঝাঁপ দিয়ে মানস-লোকের সন্ধান করতে পারলে সেখানে কেবল দেখা যায় সৌন্দর্যের প্রতিফলন। তখন নিমিত্তও নিত্যে লীন হয়ে যায়।

ভেদ ঘুচে তখন অভেদানন্দে মন মাতোয়ারা হয়ে ওঠে। এই যে প্রেম, এর যথার্থ রূপের কথা উল্লেখ করে বাউল বলেছেন—

"নিত্য দ্বৈত নিত্য ঐক্য
প্রেম তার নাম।"

এ সুরের সঙ্গে নিবিড় যোগ দেখতে পাই তান্ত্রিকদের 'অদ্বয় সত্তা' সন্ধান। সেখানেও দ্বৈত অদ্বৈতের ভেদ ঘুচে গিয়ে শিব ও শক্তির এক অতনু-দ্যুতি আভাসিত হয়। এই সহজ মিলনের মাঝে 'আমির' অহংকার বলে কোন বস্তুই থাকে না। সবই যেন 'তুমি'-ময় হয়ে যায়। মধুময় হয়ে ওঠে আকাশ মাটি বন মরু। যা দেখি তা সবই যেন মধু। সেও মধু। আমিও মধু। মধুতে মধু মিলে বিশ্বকে মধুময় করে তোলে।

এ প্রমাণ খুঁজতে গিয়ে প্রত্নতাত্ত্বিকের মত মাটি খুঁড়তে হবে না। আমাদের চোখের 'পরই উদাহরণ হয়ে রয়েছেন কবি চণ্ডীদাস। চণ্ডীদাসের রাধিকার মাঝে পেলাম কি, একবার বিচার করা দরকার। সেখানে প্রথমেই আমরা দেখতে পাই শ্রীমতী উন্মাদিনীর বেশে অধীর আগ্রহে উন্মত্ত। প্রেমত্তা পদ্মার মত তার সমস্ত দেহমন বিধ্বস্ত। এলোচুল। বিস্রস্ত বসন। শিথিল কবরী। কিন্তু তবুও টাল সামলে নেয়ার কতই না যেন প্রচেষ্টা। একটা তীব্র অতৃপ্তি লয়ে শ্রীমতী কৃষ্ণ-প্রেম-পিয়াসিনী হয়ে করজোড়ে তাকিয়ে আছেন মেঘপানে। নয়ন স্থির হয়ে গিয়েছে। মেঘলোকে তিনি ডুবে গিয়েছেন। কৃষ্ণবর্ণে মেঘ সুন্দর হয়ে তাঁর চোখে এসে ধরা দিয়েছে। শুধু তাই নয়—কৃষ্ণরূপের দর্শন-তিতিক্ষায় ময়ূরের কণ্ঠপানে অপল-আঁখিপাতে তাকিয়ে আছেন তিনি। কৃষ্ণের সঙ্গে নব পরিচয় হচ্ছে শ্রীমতীর। আহা সে কি বিহ্বল-ভাব। কি বিনয় মধুর প্রার্থনা। মুখে কথা নেই কিন্তু নয়নে নীরব আকুলতা মূর্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু কৃষ্ণ-প্রেম-পাগলিনী তার ধ্যানের দেবতার সন্ধান না পেয়ে আবার ক্রোধের কাঠিন্যে মান অভিমান করছেন। সে ক্রোধও

যেন মধুর রূপ-পরিগ্রহ করে ভাব-সায়রে দোলা দিয়ে যাচ্ছে। আঘাত বেদনা, মান ও অভিমানের আগুনে জ্বলে তাকে না পেয়ে ফিরে আসার মর্মন্তুদ বেদনা—অশ্রুসম্পাত—কাতোরোক্তি—অবশেষে ভগ্নমনে সুরধুনী তীর থেকে প্রত্যাবর্তনের মর্ম-দীর্ণ বেদনাই চণ্ডীদাসের কবিতার প্রতিটি ছত্রে ছত্রে রূপ-পরিগ্রহ করেছে। তবুও যেন সেই বেদনা—সেই কষ্ট সইতেই তাঁর তৃপ্তি। কষ্টের মধ্য থেকেই কষ্টাতীত হতে চাইছে বিলোল-মন।

"যথা তথা যাই আমি যতদূর পাই।
চাঁদ মুখের হাসে তিলেক জুড়াই॥"

এ কথা বলা যায় না কাউকে। এ যে অন্তরের সম্পদ। কে বুঝবে এর জ্বালা? চাঁদমুখের মধুস্নিগ্ধ আভাতি যে কি তা বলতে গেলে যে কণ্ঠ আড়ষ্ট হয়ে আসে। চোখের দৃষ্টি অশ্রুর প্লাবনে যায় ঝাপসা হয়ে। সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা একযোগে এসে হৃদয়ের বিলাপকে নিয়ে যায় ভাসিয়ে। সে যে সুখ-দুঃখ, অশ্রু-কম্প, স্বেদ-পুলক-বিজড়িত। তার কথা কি মুখে ব্যক্ত করা সম্ভব? অনুভূতির স্পর্শে এ ভাবের পারাবারের সংবাদ জেনে নিতে হয় যে—

গুরুজন আগে, দাঁড়াতে নারি
সদা ছল ছল আঁখি।
পুলকে আকুল, দিক নেহারিতে,
সব শ্যামময় দেখি॥"

যেদিকে তাকায় সে দিকেই শ্যামরূপ। বন মরু সব যেন শ্যাম-শোভায় সুন্দর। তার কথা ভাবা যায় না। কান্নায় বক্ষ দীর্ণ হয়ে যেতে চায়। এ কান্নার মাঝে লুকানো রয়েছে অপূর্ব সুখ। এ সুখ বোঝে না কেউ। এ যে গভীর সুখ। দুঃখেও চোখ ফেটে অশ্রুধারা নির্গত হয়, আর গভীর সুখেও অশ্রুর জোয়ার বয়ে যায়। সে যে স্মরণে, বরণে,

স্বপনে গভীর সুখ-ভাণ্ডার এনে তুলে ধরছে। তাকে ভাবতে গেলেই পুলক জাগে। তার নাম নিলেই নয়ন সিক্ত হয়ে যায়। তার ধ্যান করলে বাহ্যিক সত্তা বিলুপ্ত হয়ে যায়। শত চেষ্টা করেও এ পুলক, অশ্রু, স্বেদ ও কম্প থেকে মুক্তি মেলে না। এ আনন্দ-নৃত্যের সীমাও নেই যে। এত সুখ এত দুঃখ এ কথা আর কে বুঝবে? হৃদয় দিয়ে হৃদয়ের সব সংবাদ জানতে না পারলে এ প্রেম যমুনার কল্লোল-ধ্বনির ভাষাটি কেউ বুঝতে পারে না। কিন্তু শ্রীমতী সব বুঝেও অবুঝ। পেয়েও যেন হারিয়ে যাবার আক্ষেপে আকুল। তাইতো তাঁর বিবেক-বিশ্বে সুখের সকাল কনক-দ্যুতি ছড়িয়ে দিলেও সুখ যেন তিনি পাচ্ছেন না। কেন?

"এ হেন বঁধুরে মোর যে জন ভাঙায়।
হাম নারী অবলার বধ লাগে তায়॥"

প্রেমের অভিমান, ভালবাসার প্রতিশোধ বড়ই মধুর। বড়ই সুন্দর। এ যেন ঠিক একটি শিশুর সারল্যের প্রতিচ্ছায়া। মাকে না হলে তার চলবেনা সে ভালো করেই জানে। কিন্তু তবুও মায়ের স্তনের 'পর অভিমান করে মুখ থুবড়ে বসে আছে। মুখে বলছে—খাব না তোমার দুধ।—কিন্তু এযে কত বড় মিথ্যা, কত বড় আত্ম-প্রবঞ্চনা তা সে নিজে খুব ভালো করেই জানে—

"এক কর্ণ বলে আমি কৃষ্ণনাম শুনব।
আর এক কর্ণ বলে আমি বধির হইয়া রব—
ও নাম শুনব না॥"

না পাওয়ার আক্ষেপে অভিমানী-মন দ্বন্দ্বের দোলায় দুলছে। এক মন বলছে—'আমি কৃষ্ণনাম শুনব।' আর মনটা যেন অভিমানে ফেটে পড়ছে—'আমি বধির হইয়া রব—ও নাম শুনব না।' কিন্তু ও নাম না শুনলে চলবে কি? একবার পিছু যায়, একবার

এগিয়ে আসে। একবার পাষাণ হয়, আবার তা গলে গলে প্রস্রবণ হয়ে যায়। কোনটা সত্যি, কোনটা অভ্রান্ত তা যে মনও বোঝে না। বঁধুর বেদনা এসে কখন যে চোখের জল হয়ে নিঃশেষিত হয়ে যাচ্ছে তার খবর রাখে কে? চণ্ডীদাসের রাধার মান করে বসে থাকবার শক্তি নেই। যার চিন্তায় আত্মা তদ্‌গত হয়ে যায়, যার স্মরণে সমস্ত ইন্দ্রিয় নৃত্যের তালে তালে মনকে ডেকে জাগায়, সে মন কি কখনো মান করতে পারে?

"যত নিবারিয়ে তায় নিবার না যায়।
আন পথে ধাই তবু কানু পথে ধায়॥
এ ছার রসনা মোর হইল কি বাম।
যাঁর নাম নাহি লব লয় তাঁর নাম॥
এ ছার নাসিকা মুঞি কত করু বন্ধ।
তবু ত দারুণ নাসা পায় শ্যাম গন্ধ॥
সে কথা না শুনিব করি অনুমান।
পর সঙ্গে শুনিতে আপনি যায় কাণ॥
ধিক রহুঁ এছার ইন্দ্রিয় আদি সব।
সদা যে কালিয়া কানু হয় অনুভব॥"

এবারে একবার ভেবে দেখুন রামীর কথা। চণ্ডীদাসের রাধা যেন সেই রামীরই রূপান্তর বলে মনে হয়। মানুষী প্রেমের বিরহ বেদনার জ্বালায় জ্বলে জ্বলে নিকষিত হেম হয়ে গেছেন রামী। তাঁর তো আর কিছু চাই না। তিনি যে অভিমান করেও রইতে পারতেন না। তাই তো একবার আগু একবার পিছু, এমনি করে করে অবশেষে কোথায় হয়েছিল তার উত্তরণ? স্মরণ করা যেতে পারে সেই নিমন্ত্রণালয়ের কথাটি। মান নেই, ভয় নেই, নেই কূল, শীল ও কলঙ্কের দুর্ভাবনা। অধীর হয়ে ছুটলেন তিনি। দাঁড়ালেন

এসে সমাজের আরক্ত আঁখির দুয়ারে। একে উন্মাদিনী বৈ কি বলা যেতে পারে। প্রেম-পাগলিনী রামী চণ্ডীদাসের ললাটিকা কন্যা। তিনি কেমন করে দূরে দাঁড়িয়ে থাকবেন? এখানে কোন বাধাই তাঁর পথ রুদ্ধ করতে পারে না—

"সতী কি অসতী, তোমাতে বিদিত
ভালো মন্দ নাহি জানি।
কহে চণ্ডীদাস, পাপ পুণ্য মম
তোমার চরণ মানি॥"

চণ্ডীদাসের মত প্রেমের উপলব্ধি অন্যান্য বৈষ্ণব কবিদের হলেও এমন মাধুর্যমণ্ডিত হয়ে তা অভিব্যক্ত হয়নি। এ যেন প্রাণের রসে স্নাত হয়ে হৃদ্‌মন্দিরের সমস্ত আবেগ ও ভালবাসার একটা অনন্ত মহিমায় অপূর্ব হয়ে উঠেছে। সারল্যের দিক থেকে অথবা ভাব-কল্পনার দিক থেকে, যে দিক থেকেই হোক বিচার করলে চণ্ডীদাসের প্রেমকে আমরা সহজ ও স্বাভাবিক বলেই আখ্যা দিতে পারি।

শুধু ভক্তি ও ভালোবাসা সম্বল করে তাঁর কাব্যলক্ষ্মী এসে তাঁর মাঝে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। পাণ্ডিত্যের বাহারে তা শ্রুতিকটু বা জড়ান অভিব্যক্তিতে জটিল হয়ে ওঠেনি কোথাও। হৃদয়ের দুয়ার খুলে গেলে সেখানে শুধু নিরাভরণ বস্তুরই স্ফুরণ ঘটে। তা যেমন শিশুর সারল্যে মধুর, তেমনি বিরহিণীর ব্যথায় বিধুর। এর তুলনা নেই। বাশুলী দেবী কবিকে যে প্রেম শিখাতে পারলেন না, স্বয়ং ব্রহ্মা যার চিত্তে জ্ঞান-ভাতি বিকিরিত করতে সক্ষম হলেন না, সেখানে রামী এসে তাঁর সমস্ত দুয়ার খুলে দিয়ে তাঁকে আলোয় আলোময় করে তুললেন। মানুষকে যথার্থ প্রেমের ডোরে বাঁধতে পারলেই সেখানে ঈশ্বরের আবির্ভাব ঘটে। এ নিয়ে পূর্বেও আমি আলোচনা করেছি। চণ্ডীদাসের কাছে মানব উপেক্ষার নয়—

একান্ত সত্য ও শাশ্বত। আর একথা তিনি নিশ্চিত বুঝেছিলেন যে—এই রাগীর অন্তর-রমণের মাঝ দিয়েই শ্যাম-রমণের যোগ্য করে নিতে হবে নিজেকে। এ মন-মৈথুনের আনন্দ মর্ত্যের নয়, স্বর্গের। অবশ্য সে স্বর্গ সুদূরের নীল আকাশ কল্পনা করলে ভুল করা হবে। এ স্বর্গ হলো আত্মার আকাশ। আত্মায় আত্মা যুক্ত হলে যে আনন্দ তাকেই আমি মনমৈথুন বলে আখ্যা দিয়েছি। আমার মনে হয় এ বিশ্বপ্রকৃতির কোন কিছুই উপেক্ষণীয় নয়। প্রেম যদি মনে দানা বাঁধে তবে তা একদিন না একদিন অমৃত-প্রস্রবণের সন্ধান করে নেবেই নেবে। তা ধোপানীকে কেন্দ্র করেই হোক, আর 'অমুক' দিদিকে কেন্দ্র করেই হোক। তাইতো দেখতে পাই এই মানুষের জয় ঘোষণা করে কবি চণ্ডীদাস বললেন—

"শুনহে মানুষ ভাই
সবার উপরে মানুষ সত্য,
তাহার উপরে নাই।"

চণ্ডীদাসের সবচেয়ে যেটা গুণ ছিল তা হলো তাঁর সারল্য। কাব্যের কুসুমাস্তীর্ণ কাননে কাননে বিচরণ করে তিনি যে ফুল কুড়ালেন এবং অর্ঘ সাজিয়ে প্রেমের অর্চনা করলেন তার একটিও পলাশ বা শিমুল ফুল নয়। প্রতিটি কুসুমই সুগন্ধ ও সুন্দর। চণ্ডীদাস সম্বন্ধে একজন কবি বলেছেন—

"সরল তরল রচনা প্রাঞ্জল প্রসাদ গুণেতে ভরা।"

সত্যি কথা। এমন প্রাঞ্জল অলঙ্কার বর্জিত প্রাণস্পর্শী ভাষা দুর্লভ বললেও অত্যুক্তি হবে না। এই সারল্যের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অন্তরের অনুভূতি ও প্রতিভার দ্যুতি। সব মিলে এক অপূর্ব মাধুর্যে তাঁর প্রেমগীতিগুলি গঙ্গাযমুনার মতই স্বচ্ছ, সুন্দর ও প্রবহমান হতে পেরেছে।

"এ ঘোর যামিনী মেঘের ঘটা
কেমনে আইল বাটে
আঙিনার কোণে বঁধূয়া তিতিছে
দেখিয়া পরাণ ফাটে।"

গীতি-কবিতা হলেও এ যেন কথাশিল্পীর যাদু বিস্তার করে দিয়ে অন্তর-মনকে জুড়ে বসে আছে।

"আপনার দুখ সুখ করি মানে
আমার দুখেতে দুখী,
চণ্ডীদাস কহে কানুর পীরিতি
শুনিতে জগত সুখী।"

প্রেমের একটা সার্বজনীন রূপ এতে পরিস্ফুট হয়েছে। এ প্রেম-মন্ত্র প্রত্যেক প্রেমিক প্রেমিকার অন্তরেই সাড়া জাগাতে সক্ষম। কোন কোন ক্ষেত্রে কথাশিল্পীর বিস্তৃত পরিধির সীমাকে লঙ্ঘন করে গিয়েছে মাত্র কয়েকটি ছত্র। এমন নজিরও চণ্ডীদাসে বিরল নয়—

"পরাণ বঁধূরে স্বপনে দেখিনু
বসিয়া শিয়র পাশে,
নাসার বেশর পরশ করিয়া
ঈষত মধুর হাসে।
পিয়ল বরণ বসনখানিতে
মু'খানি আমার মুছে
শিথান হইতে মাথাটি বাহুতে
রাখিয়া শুতল কাছে।"

প্রেমিকার এ স্বপ্নদর্শন জ্ঞানদাসও লিখেছেন—

"রজনী শাঙন ঘন দেয়া গরজন
রিমি ঝিমি শবদে বরিষে,
পালঙ্কে শয়ান রঙ্গে বিগলিত চীর অঙ্গে
নিন্দ যাই মনের হরিষে।"

কিন্তু কোথায় চণ্ডীদাসের দরদ ও সরলতা? এ কবিতাকে মধুর বলা যেতে পারে। কিন্তু চণ্ডীদাসের রচনার ন্যায় প্রাণবন্ত ও মর্মস্পর্শী বলা যায় না। চণ্ডীদাসের রস দুঃখের স্পর্শে সুন্দর। এক কথায় বললে বলতে হয়, কবির কাব্য-প্রতিভার ভিত্তিভূমি দুঃখবাদের 'পর প্রতিষ্ঠিত। এবং তা বিচ্ছেদ-বেদনায় মর্মান্তিক। এর কারণ খুঁজতে গেলে রামী-বিরহ বৈ আর তো কিছু চোখে পড়ে না। পিরীতের দুঃসহ দহনে জ্বলে পুড়ে কবির অন্তরখানা পিরীতিকেই প্রাণের একমাত্র বস্তু বলে গ্রহণ করেছিল।

"পিরীতি বলিয়া এ তিন আখর
ভুবনে আনিল কে।
মধুর বলিয়া ছানিয়া খাইনু
তিতায় তিতিল দে॥"

* * * *

"পিরীতি পিরীতি সবজন কহে
পিরীতি সহজ কথা।
বিরিখের ফল নহে ত পিরীতি
নাহি মিলে যথা তথা॥"

Sex instinctএর আওতায় ফেলে এ পিরীতকে বিচার করা চলে না। যাঁরা মনে করেন, Love based on sex তাদের যুক্তি-বিচারকে বৈষ্ণবরা অস্বীকার করেননি। তবে হ্যাঁ সে সম্বন্ধে বড় সুন্দর একটি উক্তি আছে—কৃষ্ণদাসের—

"আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি বাঞ্ছা
তারে বলি কাম;
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা
ধরে প্রেম নাম॥"

তার্কিকদের প্রেমকে বৈষ্ণবরা বলেছেন কাম। তবে প্রেম কি?

"প্রেম আমার পরশমণি
তারে ছুঁইলে যে কাম হয়রে সেবা।"

খাঁটি প্রেম ঠিক যেন পরশ পাথর। তার স্পর্শে জীবনের কাম সেবায় নিয়োজিত হয়ে যায়। এ প্রেমের সবচেয়ে বড় কথা হলো দুঃখ। প্রেমের সার্থক রূপ আমরা দেখতে পাই কোথায়? যেখানে মানুষ বিরহানলের জ্বালা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করে নেয়। এবং আজীবনের সঙ্গী করে তাকে বুকের মধ্যে ঝাপ্‌টে রাখে। এ প্রেম মানুষের সহজলভ্য নয়, এর জন্যে রস ও রসের নিবিড়তা দরকার। এ প্রেমে ইন্দ্রিয় শিথিল হয়ে মনকে চির নতুন করে রাখে। যতই জ্বালা বাড়ুক না কেন কিছুতেই এ প্রেমের স্পর্শ যে পেয়েছে সে আর ছাড়তে চায় না। ছাড়তে পারে না। তার মন চিরন্তন এক কথাই বলবে—প্রেম না হলে মনুষ্য জীবন বৃথা। পৃথিবীর সবচেয়ে দুর্লভ ধন এই প্রেম। এবং তা চিরদিন দুঃখকেই সঙ্গে করে চলে। চণ্ডীদাস সেই দুঃখের সাগরে ঝাঁপ দিয়ে যে মণি-মাণিক্যের ঝাঁপি ভরে এনেছেন, তার তুলনা বৈষ্ণব সাহিত্যে কেন, সারা বিশ্বের সাহিত্যেও বিরল বললে অত্যুক্তি হবে না।

"চণ্ডীদাস কহে শুনহে নাগরে
পিরীতি রসের সার।
পিরীতি রসের রসিক নহিলে
কি ছার জীবনে তার।"

এবারে কবির মৃত্যু সম্বন্ধে দু-চারটা কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করব। দুঃখের কবি দুঃখের মধ্যে দিয়েই জীবনের খেলা শেষ করে দিয়ে অসীমের লীলাপথে চলে গিয়েছিলেন।

কবির মৃত্যু সম্বন্ধে রামী-রচিত একটি গীতিকা থেকেই এর যথাযথ প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে।—

"কাঁহা গেয়ো বন্ধু চণ্ডীদাস।

চাতকি পিয়াসীগণ না পাইয়া বরিসন

নঅানের নাগরে পিয়াস।"

কি করিল রাজা গৌড়েশ্বর।

না জানিঞা প্রেম লেহ ব্রেথাই ধরিস দেহ

বধ কৈল প্রাণের দোসর॥

কেনে বা সভাতে কৈলে গান।

স্বর্গ-মঞ্চ পাতালপুর আবির্ভূত পঞ্চনর

মানিনীর না রহিল মান॥

গান শুনি পর্চ্ছার বেগম

রাজারে কহে জানিঞা মরম॥

রাণি মমঃ কথা রাখিতে নারিল।

চণ্ডীদাস সনে প্রিত করিতে হইল চিত

তার প্রিতে আপন খুয়ল্যা॥

রাজা কহে মন্ত্রিরে ডাকিয়া।

তরার্ণিত হস্থি আমি পিষ্ঠে পেলি বান্ধা টানি

পিষ্ঠে খুদে বৈরী ছাড় গিয়া॥

আমি অনাথিনী নারী মাধবির ডালে ধরি

উর্চ্চস্বরে ডাকি প্রাণনাথ।

হস্থি চলে অতি জোরে ভালস্তে না দেখি তোরে

মাথাএ পড়িল বজ্রাঘাত॥

রাণি কহে ছাড়িয়া না যায়।

কহিতে কহিতে প্রাণ আর দেহ সমাধান

দুহুঁ প্রাণ একত্রে মীলায়॥"

* * * * *

ঘটনাটি সম্বন্ধে আর একটু বিশদভাবে আলোচনা করা যাক—

নান্নুরে বাশুলী মন্দিরের সম্মুখে ছিল একটি নাট্যশালা। চণ্ডীদাস তাঁর কীর্তনের দল নিয়ে সেখানে গাইছিলেন গান। গান শুনে নবাব তাঁকে আমন্ত্রণ করে নিয়ে যান তাঁর প্রাসাদে। সুরু হলো গান। ভাব-তরঙ্গে উদ্বেল চণ্ডীদাস বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে প্রেমমন্ত্রে মুখর। গান শুনে বেগম একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। তাঁর অন্তরে এলো প্রেমের যমুনা উচ্ছ্বাস। আর রইতে পারলেন না তিনি। পাগলের মত মান-লাজ-কুল-শীলের কথা ভুলে গিয়ে চণ্ডীঠাকুরের গান শুনবার জন্যে ছদ্মবেশে ঘুরতে লাগলেন পল্লী থেকে পল্লী। নবাবের নিষেধ তাঁকে বিরত করতে পারল না। এবারে নবাবের রোষ-রক্তিম আঁখি প্রত্যক্ষ করল কবি চণ্ডীদাসকে। সে দিনও নাট্যশালায় কীর্তন হচ্ছিল। সহসা কামানের শব্দ হলো। বাঙলার মরমী-মানুষ চণ্ডীদাস তাঁর দলসহ মৃত্তিকাবক্ষে সমাধিগ্রস্ত হলেন।

রামী ও বেগম দুজনেই এ মর্মন্তুদ মুহূর্ত দেখছিলেন। সে এক করুণ দৃশ্যই বটে। মৃত্যুর প্রাক্ লগ্নে চণ্ডীদাস রামীর পানে অপলক নয়নে তাকিয়ে ছিলেন। বেগম যেন এ দৃশ্য সহ্য করতে পারলেন না। তিনি মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন। এই মূর্চ্ছাই তাঁর শেষ মূর্চ্ছা হলো। এ মহা মমতা আর ভাঙল না। বেগমের মৃত্যু রামীকে দিল এক অনির্বচনীয় শ্রদ্ধার সম্পদ। তিনি বেগমের পদযুগল স্পর্শ করলেন। রাখলেন চোখের দু'ফোঁটা জল।

বেগমকেও চণ্ডীদাস ভালবেসে ফেলেছিলেন। রামী বলেছিলেন —বাশুলী, তোমায় শুধু আমাকে ভালবাসতে বলেছেন, তুমি তাঁর আজ্ঞা লঙ্ঘন করলে কেন ?”

বাদশাহকে বলেছিলেন রামী, যাঁর সুস্বরে ভুবন মুগ্ধ, যিনি প্রেমের

মূর্তিমান বিগ্রহস্বরূপ, তাঁকে মনে করে না সামান্য মানুষ। তাঁকে বিনষ্ট করলে পৃথিবীতে এ লজ্জা রাখতে পারবে না।

যে ব্যক্তি রাজপাটে বসেও প্রেমের আস্বাদ পায়নি, তার জীবন নিরর্থক।

কবির দুই প্রেমিকার দীর্ঘশ্বাসে বাঙলার নরনারী ব্যথিত। ইতিহাসের পক্ষপাতিত্বে গৌড়ের বাদশাহের নামটি অব্যক্তই রইল। তবুও এই মরম-দরদী কবির সে করুণ মুহূর্তটি প্রত্যেক বাঙালী চিত্তে চিরদিন দুঃখের স্মরণে অঙ্কিত হয়ে থাকবে।

বিদ্যাপতির কবি-মানস

কবির কাব্যিক আকাশের মৌসুমী বায়ু কোন্ পথে কেমন করে মানব চিত্ত-তীর্থে এসে সাড়া জাগিয়ে যায় তা যেমন দেখা দরকার, তেমনি দেখা দরকার তার গতি, প্রকৃতি, রূপ, রস ও ভঙ্গি। কোন্‌টির স্ফুরণ কতটুকু ঘটেছে, কোন্‌টি তন্দ্রাজড়িমা হয়ে ঝাপসা কুয়াশার কুহেলিতে কীর্ণ হয়ে আছে এবং কি ভাবে কতটুকু বেদনা লয়ে কবি-মন মীড় মূর্চ্ছনায় বেহাগ থেকে দীপকে সুর তুলেছে, এর সব-কিছুর সঙ্গে একটা আত্মীয়তা স্থাপিত হলে তবেই কবিকে সমগ্রভাবে বোঝা সম্ভব।

কবি, সে তো শুধু কবিই। লিখেই খালাস। তাকে নিয়ে যুক্তি-বিচারের সিদ্ধান্তশালায় হাজির হতে হয় সামাজিকগণকে। এবং তার কাব্যিক আকাশের বিচিত্র চিত্র অঙ্কিত করে তাকে একটি জাত্‌ভুক্ত করে নিতে হয়। স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে, তবে আলোচ্য কবি ছিলেন কোন্ জাতের?

এ প্রশ্নটির যথার্থ জবাব দিতে হলে গীতি-কাব্যের কবি-রস সম্বন্ধে প্রথমে একটু আলোচনা করা দরকার। কারণ কবির ভুবনে যে কানন-কুন্তলা শ্যাম সমারোহ সেখানে কোকিলের কণ্ঠে সাড়া জাগল, না মলয় নিঃস্বনের ধ্বনিতে বেণু বনকে মর্মরিত করল তা বুঝতে না পারলে কবি-ব্যক্তিত্বের যথার্থ পরিচয় জানা যায় না। দৃশ্যমান জগতের পানে তাকিয়ে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যানুশীলনে কবি কতখানি ভাবসায়রে তলিয়ে যেতে পেরেছেন এ যেমন দেখবার প্রয়োজন আছে, তেমনি প্রয়োজন আছে তাঁর কবি-ব্যক্তিত্বের সঙ্গে বহির্বিশ্বের সুর সঙ্গতের উৎসটি অনুসন্ধানের।

গীতি-কাব্যের কবি-মন দ্বৈত দীক্ষিত হতে পারে। একটি হলো বাহ্যিক-দীক্ষা। অপরটি হলো অন্তর-দীক্ষা। এই দুই দীক্ষার আবার দুই রূপ এবং দুই মন। দৃশ্যমান জগতে যা হচ্ছে বা ঘটছে তার প্রভাবে কবি-মন কখনো মুগ্ধ, সুন্দর আবার কখনো বিকৃত এবং বেদনাহত। সাধারণ পাঠক-মনের খোরাক এতে প্রচুরই আছে। এ শ্রেণীর কবি-মন থেকে যা উৎসারিত হয় তা থেকে রস আহরণে পাঠক-চিত্ত এতটুকুও শ্রমশ্রান্ত হয়ে পড়ে না।

এবারে অন্তর-দীক্ষা বা মনোদীক্ষার স্বরূপটি কি, তা জানা দরকার। সেটির ধর্ম ও রূপই বা কি? এখানে আরো একটি প্রশ্ন ওঠে। তা হলো এই যে, যে কবি-মন ভাবের সায়রে নিমজ্জিত তা থেকে রস উপলব্ধি ও রস পরিবেশন এই দুই কাজ কি একই সময়ে সম্ভব?

আমাদের আলঙ্কারিকগণের মতামত দ্রষ্টব্য—তাঁরা বলেন, রসের স্রষ্টা হতে হলে প্রথমে দ্রষ্টা ও ভোক্তা হতে হবে। কিসের দ্রষ্টা ও ভোক্তা হতে হবে?

বিষয়ের।

তা হলে বলতে পারা যায়, এক আধারে দুই মন দুই পৃথিবীর রস পরিবেশন ও পরিগ্রহণ করতে সক্ষম। এখানে ভরত মুনির একটি উক্তি উদ্ধৃত করে আর একটু স্পষ্ট হওয়া যাক—

"যথা বীজাদ্ ভবেদ্ বৃক্ষো বৃক্ষাৎ পুষ্পং ফলং যথা।
তথা মূলং রসাঃ সর্বেতেভ্যো ভাব ব্যবস্থিতাঃ॥"

—নাট্যশাস্ত্র, ৬।৩২

কবিগত রস সম্বন্ধে ভরত মুনির এ উক্তিটি চমৎকার। বীজ থেকে বৃক্ষ, বৃক্ষ থেকে পুষ্প এবং ফল যেমন পরিণতি লাভ করে, ঠিক তেমনি কাব্যেও রসই হলো বীজ। তা থেকেই ভাব ও মহাভাবের প্রকাশ। এ কথা বলেছেন অভিনব গুপ্তও—

"এবং মূলবীজস্থানীয়াৎ কবি গতো রসঃ।"

এ ব্যাখ্যা থেকে আমরা কি পাই ?

পেলাম কবি-শক্তির দুটি উপলব্ধির মন। একটি হলো দৃশ্যমান জগতের প্রত্যক্ষীভূত ভাব। এবং কবি ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সামাজিক চিত্তের ঐক্যে রস আস্বাদন। কিন্তু এই রস লাভ এক সঙ্গে হলেও কবি-প্রকৃতি ভাব থেকে স্বতন্ত্র। বহির্বিশ্বের আঘাত, সংঘাত, সুখ দুঃখ বেদনায় সামাজিক মন মূর্চ্ছিত, মুগ্ধ ও বিকারগ্রস্ত। কিন্তু কবি-চিত্ত ? সেখানে নির্লিপ্ত। তৃতীয় ব্যক্তি। দর্শক মাত্র। এবং রসের নাগর। এখানে আর একটি কথা বলা প্রয়োজন। তাহলো এই—যে মনে শূন্য শান্ত সমাহিত এক নিঃসীম অনন্তের ছায়া সঞ্চারিত হয়ে কবি-চিত্তকে বিত্ত বিরতির বিবেক বিশ্বে ডেকে নিয়ে যায়, তিনি শুধু ভাবলোকেই বিহার করেন। রসকাব্য তাঁর দ্বারা সম্ভব নয়। তিনি ভাবকাব্যের কবি হয়েই থাকেন।

দ্বিতীয় মন হচ্ছে—অনুভূতির কটাহে রসের পাক দিয়ে তার একটি রূপ দান করা। এখানেই কবি দ্রষ্টা ও স্রষ্টা। এই রূপ থেকেই সাধারণ লোক রসাস্বাদন করে থাকেন। তাঁরা বিশ্ব-বিবেকের বাণী সাধারণত বুঝে নিতে সক্ষম নন। তাঁরা দ্রষ্টা হলেও হতে পারেন কিন্তু স্রষ্টা হতে পারেন না। তাঁরা কাক ও কোকিলের ডিম দেখে শুধু ডিমই বলতে পারেন কিন্তু পরিচয় দেওয়ার বেলায় কবি-দৃষ্টির দরকার। এখানেই স্রষ্টার সৃষ্টির মৌলিকতা।

একটি মানুষের মনকে কেন্দ্র করে বহু ভাব ও কল্পনার আবির্ভাব হয়ে থাকে। কখনো তা করুণাপূর্ণ বিষাদে ম্লান। আবার কখনো তা অপূর্ব সৌন্দর্যের প্রতীক হয়ে স্নিগ্ধ তনুকান্তিযুক্ত লাবণ্যময়ী। আবার কখনো কখনো তা দৃশ্য জ্ঞেয় স্পৃশ্য বস্তুর অতীত লোকে অনন্ত সৌন্দর্যের অনুসন্ধানে তন্ময়। এই যে বিভিন্ন ধারা ও দিক একটি

মনের ব্রহ্মাণ্ডে বিরাজমান তা সকলে বুঝেও বুঝে উঠতে পারেন না। কিন্তু কবির নিরপেক্ষ দৃষ্টি থেকে এর একটিও পালিয়ে যেতে পারে না। তাঁর সূক্ষ্ম মনের মণিকোঠায় প্রতি দিবসের প্রতিটি কর্ম এসে এক-একটা অধ্যায় রচনা করে রেখে যায়। কবি সেখানে স্রষ্টার আসনে দ্রষ্টা হয়ে সমাসীন থাকেন।

আমাদের আলোচ্য কবি হলেন বিদ্যাপতি। এই বিদ্যাপতি সম্বন্ধে এখন একটু আলোচনায় প্রবৃত্ত হব। ইনি মধ্যযুগের কবি। কেহ কেহ বিদ্যাপতিকে পূর্ব-ভারতের মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ কবি বলেও আখ্যয়িত করেন। তবে এই কবি-শক্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আরো একটি নাম আমাদের চিত্তপটে উদিত হয়। তিনি হলেন চণ্ডীদাস। চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির কবি-মানস যেন ঠিক একই পুষ্পের দুটি পাপড়ি।

একই কবি-ব্যক্তিত্বের দুই রূপ এই দুই কবির অন্তর-মনকে তীর্থান্বিত করেছে।

মানুষের যা সহজাত ধর্ম তা সম্পূর্ণভাবেই প্রত্যক্ষীভূত হয় বিদ্যাপতির মধ্যে। তাই বলতে হয় কবি-মানস দ্বৈত দীক্ষায় দীক্ষিত। এবারে এই দ্বৈত দীক্ষাটি কি তাই নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক।

মানুষের অন্তর-সমুদ্রে বিভিন্ন ভাবের উদ্বোধন হয়। স্ফূরণ ঘটে বিভিন্ন কল্পনার। কিন্তু সে ভাব ও কল্পনাগুলো জলবুদ্‌বুদের মত মিলিয়ে গিয়ে তার একটা সম্মিলিত রূপ প্রকাশ পায়। এই রূপ ঐশ্বর্যের সাম্রাজ্যে কখনো শান্তির ললিত সঙ্গীত ধ্বনিত হয়ে ওঠে, কখনো বা ঝড়ের গর্জনে জীবনের যৌবনকে আন্দোলিত করে দিয়ে খর প্রবাহের ক্ষীণ মনটিকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়। কে ছুঁয়ে যায়—কেন ছুঁয়ে যায় এইটেই হলো জিজ্ঞাসা ও সমস্যা।

আমরা জানি মানুষের মন যা ভাবে প্রাণ তা সর্বদার জন্য গ্রহণ

করতে চায় না। কিন্তু মনের মাধবীকুঞ্জে যে কোকিল ডেকে যায়, যে বসন্তের প্রাণ-চেতনায় বিথী-সিথি এলো-মেলো হয়ে ওঠে, তার পানে ক্ষণেকের জন্তে একটু তাকানোর বাসনা থেকে বিরত হওয়াও যেন যায় না। এই বিরতির বেলাভূমে যখন মন এসে দাঁড়ায় তখন সে প্রাণের সঙ্গী। প্রাণময় হয়ে প্রতি দিবসের কর্ম থেকে এক রকম অবসর নিয়ে বসে। এ স্তরটি শেষের। প্রথমেই যদি শেষের গান ধরে বিশ্বসভায় আবির্ভূত হতে হয়, তবে মানুষের সহজ পরিচয়টির একদিক সম্পূর্ণ প্রদোষাচ্ছন্নই থেকে যায়। এবং রস চেতনার অবকাশ থেকে পালিয়ে এসে ভাব-লোকে বিচার করা ব্যতীত তার দৃষ্টির দুয়ারে আর কোন পথ আভাসিত হয় না।

বিদ্যাপতির বেলায় এইজন্যেই বলতে হয়—কবি সহজ মানুষ। নিয়ম ছন্দে বাঁধা আট-সাট তার কবি-ব্যক্তিত্ব। এ যেন ঠিক একই মানস-তীর্থে দুই দেবতার প্রতিষ্ঠা।

একটি মানস-লোকে দুই বিভিন্ন ভাব-কল্পনার স্ফুরণ ঘটেছে বিদ্যাপতির মধ্যে। প্রথম স্তরে কবি কণ্ঠে যে সঙ্গীত মাধুরিমায় আপন ব্যক্তিত্বের পরিচয় দিয়েছেন, পরবর্তী কাব্য-রচনায় গিয়ে দেখলাম অন্য ভাব। অন্য ভঙ্গিমা। সেখানে প্রথম স্তরের মনোভঙ্গিটি গিয়ে দ্বিতীয় স্তরের প্রাণভঙ্গিতে রূপান্তরিত হয়ে এক ভাব-কল্পলোকে তীর্থ রচনা করেছে।

চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতিকে পাশাপাশি দাঁড় করালে কি দেখা যায়, একবার সেদিকে দৃক্‌পাত করা যাক। চণ্ডীদাসকে আমরা জানি প্রেমের কবি বলে। এখন স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে, তবে কি বিদ্যাপতি প্রেমের কবি নন? বিদ্যাপতিও প্রেমের কবি। কিন্তু তাঁর প্রেম রূপজ। চণ্ডীদাসের প্রেম নিকষিত হেম। তা নিয়ে নতুন করে আলোচনা নিষ্প্রোয়জন। কারণ চণ্ডীদাসের প্রেম তাঁর কবি-ব্যক্তিত্বের

সহজাত ধর্ম। তাঁর ন্যায় প্রেম-মর্মের উপলব্ধি আর কোন কবির হয়েছিল কিনা সন্দেহ।

"আঁখির নিমিষে যদি নাহি হেরি
তবে সে পরাণে মরি।
চণ্ডীদাস কহে পরশ রতন
গলায় গাঁথিয়া পরি॥"

চণ্ডীদাসের প্রেম তাঁর ব্যক্তি পুরুষের কণ্ঠহার। তাকে চোখের আড়াল করতে মন নারাজ। সর্বদার জন্যেই অন্তরে শঙ্কা। পাছে বুঝি সে হারিয়ে যায়—

"দুঁহু কোরে দুঁহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।
তিল আধ না দেখিলে যায় যে মরিয়া॥"

এমন প্রেম মনুষ্য-প্রকৃতিতে অপ্রাকৃত। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেছেন যথার্থ কথা—

অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম যেন জম্বুনদ হেম
হেন প্রেমানৃলোকে না হয়।
যদি হয় তার যোগ না হয় তার বিয়োগ
বিয়োগ হৈলে কেহ না জীয়য়॥

এমন প্রেম যেমন দুর্লভ, তেমন আবার এ প্রেম-স্পর্শ পেলে বিচ্ছেদ-ভাবনায়ও অস্ত হয়ে যেতে চায় জীবন। এতো সহজ লক্ষণ। যাকে হৃদয়ের গহন তলে একবার ঠাঁই বিছিয়ে বসানো যায়, সে যে কত আপনার তা বলা কঠিন। সে যেন প্রতিনিয়তই হারিয়ে যায়। তার বিরহে মন মত্ত। তার অদর্শনে মৃত্যুর সংকেত। বিদ্যাপতি এখানে বলেছেন—

"এ সখি অপরূব রীতি।
কহাহুঁ ন দেখিঅ আইসনি পিরীতি॥"

বিদ্যাপতির রাধিকা বলেছেন—আমার প্রিয়তম আমার বাহুবেষ্টনে আবক্ষ আলিঙ্গনের মধ্যে থেকেও যেন শঙ্কান্বিত। আমি একটু এপাশ থেকে ওপাশ ফিরলেই তিনি চম্‌কে ওঠেন। ভাবেন, বুঝি আমি তাঁর 'পর মান করেছি—

"ঘুমক আলসে যদি পলটি হোউ পাস।
মনে ভয়ে মাধব উঠয়ে তরাস॥"

বিদ্যাপতির প্রেম-ধর্ম অতুলনীয় বললেও অত্যুক্তি হয় না। কারণ এ প্রেম মর্তের মর্ম-সঙ্গীত শুনতে শুনতে স্বর্গের সাধনায় তন্ময় হয়েছে। এমন সুন্দর সাবলীল ছন্দে তার প্রেম-ভঙ্গিমা সহজ থেকে সহজাতীত হয়েছে যার পানে তাকালে মনে হয়, এ যেন ঠিক আষাঢ়ের আকাশ থেকে শ্রান্তিহীন বরিষা নির্ঝর নেমে মনের মরু-হাহাকারকে তৃপ্তির শীতল স্পর্শে সজীব করে তুলেছে।

বৈষ্ণব-প্রেম সীমাহীন বলেই আমরা জানি। প্রেম বলতে তারা যে কথা বলেছেন তা ইন্দ্রিয় থেকে নিরিন্দ্রিয়ের স্বর্গ সন্ধানে তন্ময়। তা দিয়ে অন্তর-সৌধের দেবতাকেই কেবল অর্চনা করা চলে। মদনের পূজা হয় না। মানসীর হৃদ্‌-যমুনার তীরে বসে বিরহের বাঁশরী বাজানো যেতে পারে। কিন্তু প্রেয়সীর দেহ-পিঞ্জরে বসন্তের পাখীর মত সাড়া জাগানো যায় না। বৈষ্ণবদের প্রেমতত্ত্বকে বিদ্যাপতি উপমার সাহায্যে সহজ করে বুঝাতে গিয়ে বলেছেন—

"সহজ চাতক না ছাড়য় বরও
না বৈসে নদীতীরে।
নব জলধর বরিখন বিন্দু
না পিয়ে তাহারি নীরে॥"

শিক্ষিত কবি ছিলেন বিদ্যাপতি। তাঁর আসন ছিল রাজসভায়। কেবল বুদ্ধি-দীপ্তিতেই তাঁর কবিতা-কাব্য মধুর হয়নি। তার সঙ্গে

যুক্ত হয়েছে মননের পরিশুদ্ধ ভঙ্গিটি। এইজন্যেই বিদ্যাপতির কবি-মানসটি একটি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণে প্রাণবন্ত হয়ে উঠতে পেরেছে।

এবারে বিদ্যাপতির রাধা সম্বন্ধে দু-চারটি কথা বললে আর একটু স্পষ্ট হবে আমার বক্তব্য। বিদ্যাপতির রাধা বৃন্দাবন অথবা অন্তর-তীর্থ থেকে এসে তাঁর কাছে ধরা দেননি। এ রাধা-দর্শন নিছক একটি বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে মানবিক মননের অপূর্ব স্বাক্ষর বহন করছে। মানুষের যা সহজাত ধর্ম তা থেকে এক চুল টলেনি কবি বিদ্যাপতি। তাঁর অন্তরের তৃষাক্লিষ্ট পিপাসা চরিতার্থ করেছেন মনোধর্মিতার অপূর্ব স্পর্শে। তাঁর কৌতূহলী মন মানবী রাধার যৌবন-উন্মীল দেহ-কোষের রূপান্তর প্রত্যক্ষ করেছে সহজভাবে স্বাভাবিক চোখে। সেখানে রাধা নবযৌবনা সুন্দরী বৈ ভক্ত-প্রাণের দেবী হতে পারেননি। কিন্তু এই দর্শনের মাঝ দিয়েই দীক্ষিত হয়েছে তাঁর মন। তিনি ধীরে ধীরে অতলায়িত হয়ে গিয়েছেন সৌন্দর্যের সাধন-কুঞ্জে। সেখানে আর মানবী রাধার সন্ধান মেলে না। দেখতে পাই, কবি তাঁর রূপের তুলিকায় অপূর্ব করে গড়ে তুলেছেন আজন্মের সাধন ধন সুন্দরীর মানসী প্রতিমা। রূপের পথ ধরে ধরে অরূপে এসে হাজির হয়েছেন। এখানে বিদ্যাপতির সৌন্দর্যানুশীলনের চরম উৎকর্ষ। এ যেন ঠিক ভোম্‌রার মধু সন্ধানের গুণগুণানি। কিন্তু পুষ্পকোষে বসেই মৌন। তখন আর কথা নেই। কেবল অনুভূতি আর উপলব্ধির অনন্ত তৃপ্তি। রূপ থেকে রূপাতীতের ভাবলোকে বিহার।

সৌন্দর্যের কবি বিদ্যাপতি ভক্ত-মন নিয়ে রাধিকার রূপ সৃষ্টি করেননি। আত্মপ্রাণের সহজ টানে যা মানব মনের স্বাভাবিক বৃত্তি ও প্রবৃত্তি, তাই দিয়েই তিনি গড়ে তুলেছেন তাঁর প্রেম-প্রতিমা। সেখানে রাধার দুই রূপ। প্রথমত বলতে পারা যায় রাধা রাণী। দ্বিতীয়ত এই রাণীই তাঁর অন্তর-তীর্থের সমস্ত সৌন্দর্য পিপাসা মন্থন করে ভাবামৃত

পরিবেশন করে অন্তর লক্ষ্মী প্রেমময়ী হতে পেরেছিলেন। অসীম সৌন্দর্যময়ী যৌবনা যুবতীর সৌন্দর্য বিদ্যাপতি আকণ্ঠ পান করেছেন। তাতে কবির এতটুকু দ্বিধা বা দ্বন্দ্ব আসেনি। তিল তিল করে অনুসন্ধান করে দেহ-ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি ঘাটে ঘাটে এই সৌন্দর্যের সম্রাট তার তরী নিয়ে হাজির হয়েছেন। আবার অন্যদিকে দেখতে পেলাম এই দর্শনই তাঁর মনের আর একটি দুয়ার খুলে দিতে পেরেছে। সেখানে বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের রূপ পরিগ্রহ করে এই মানবীই দেবী বা ঈশ্বরী হয়ে কবির ললাটফলকে জ্যোতির্ময়ী হয়ে উঠেছেন।

এখন কথাটা দাঁড়াল এই—বিদ্যাপতির রাধায় বাস্তব ও অবাস্তবের সংমিশ্রণ সংঘটিত হয়েছে আমরা দেখতে পাই। বয়ঃসন্ধির রাধিকার পানে তাকিয়ে কবি তাঁর রূপে বিভোর। পূর্বরাগেও এই বাস্তব দৃষ্টিরই পরিচয় পাই। কিন্তু অভিসারের রাধিকা অবাস্তব হয়ে উঠেছেন। এই অভিসারে এসে কবির সৌন্দর্যের পূর্ণ বিকাশ ঘটেছে। এখানে আর রাধা মানবী নেই। একেবারে কবির সারাখানি অন্তর-মন জুড়ে মানসসুন্দরী হয়ে উঠেছে।

কিন্তু বয়ঃসন্ধির খর প্রবাহের বিদ্যুৎ ঝলকিত মুহূর্তগুলোকে কবি উপেক্ষা করে যাননি। যৌবন-বনের সবুজ অবুঝে যে কোকিল কণ্ঠে তাঁর প্রবৃত্তিগুলোকে ডেকে ডেকে সজাগ করে দিল তা দেখে কবি মুগ্ধ। শুধু মুগ্ধই নয়, একেবারে রূপের অতল সায়রে অবগাহন করবার মানসে উজ্জ্বল উদ্বেল। তিনি যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলেছেন নিরাবিল সৌন্দর্যের সরোস-লোকে। কিন্তু সে হারানোর মধ্য দিয়ে তাঁর আত্ম-বিস্মৃতি ঘটেনি। স্মৃতির স্বপ্ন-ঘেরা মধুর ব্রহ্মাণ্ড ঘিরে তখন কেবল যৌবন কৈশোরের সন্ধি লগ্নের চেনা অচেনার বিস্ময়, পুলক ও বোঝা বুঝি চলেছে। আলো আঁধার। প্রকাশ অপ্রকাশ। প্রবৃত্তি নিবৃত্তি। দ্বন্দ্ব ও মিলন কত কিছুই না যেন শ্রীমতির মতিভ্রম ঘটিয়ে আবার বিস্ময়ের সাগর-দোলায় আন্দোলিত করে যায়।

নবযৌবনা দেহ-কোষটি কমল কলির মত সৌরভ সুপ্ত। কিন্তু সেই গুপ্ত পুষ্প মাধুরী ঘিরে মধুপের মত কত গুণগুণানী। কত আকুলি বিকুলি। কখনো তন্ময়। কখনো মন্ময় আবার কখনো বা বিভোরতা। রাধিকার এই সৌন্দর্যের মধ্যে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়েও কবি মন-ভোলা হয়ে যাননি। তাঁর কবি-দৃষ্টির সম্মুখে মানবীর যে রূপ যখন আভাসিত হয়েছে তা তিনি দ্বিধাহীনভাবে রস-পিপাসুদের পরিবেষণ করতেও পেরেছিলেন। এখানেই বিদ্যাপতির বিবেক-বিশ্বের মৌলিকতা। শৈশবের খেলাঘর ভেঙ্গেছে। কিন্তু এখনো আবেশ ঘুচে যায়নি। চোখের সামনে চঞ্চলতা। মনও গিয়েছে চঞ্চল হয়ে। দেহ, মন উভয়ই একমুখো হয়ে যৌবনের পাকে পড়ে চঞ্চল হয়ে উঠছে। কবির দৃষ্টিতে শ্রীমতির এ ভাব বেশ ভালভাবেই পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। কবিও বিভোর হয়ে গিয়েছেন। কিন্তু এত সব বিভোরতার মধ্যেও হাল ছেড়ে পাল ছিঁড়ে বসেননি তিনি। কারণ এ তো শুধু তন্ময় ভাব। রস দৃষ্টির নেশা। এক কথায় বলা যেতে পারে, এ হলো কবির বাস্তব জগতের বস্তু-বিভোরতা। ভাবলোকের আত্ম-তন্ময়তা নয়। এবারে বিদ্যাপতির রসসৃষ্টির অলকায় অবগাহন করা যাক। শৈশব থেকে যৌবন এলে কিশোরীর যে কি ভাব উদয় হয়েছিল, তারই একটি চমৎকার ছবি এঁকে বলছেন কবি—

"শৈশব যৌবন দরশন ভেল।
দুহু দলবলে দ্বন্দ্বে পড়ি গেল॥
কবহু বাঁধয় কচ কবহু বিথারি।
কবহু ঝাঁপেয় অঙ্গ কবহু উঘারি॥
অতি থির নয়ন অথির কিছু ভেল।
উরজ উদয় থল লালিম দেল॥
চঞ্চল চরণ চিত চঞ্চল ভান।
জাগল মনসিজ মুদিত নয়ান॥"—(৪৯)

শৈশব যৌবনের সন্ধি লগ্ন। রাধা চঞ্চল। চঞ্চল তাঁর মন। চঞ্চল পায়ের ছন্দ। চঞ্চল তাঁর অঙ্গ ও বসন।

"খনে খনে নয়ন-কোণ অনুসরঈ।
খনে খনে বসন-ধূলি তনু ভরঈ॥
খনে খনে দশন-ছটা ছট হাস।
খনে খনে অধর আগে কঁরু বাস॥
চঁটকি চলয়ে খনে খনে চলু মন্দ।
মনমথ-পাঠ পহিল অনুবন্ধ॥
হিরদয় মুকুল হেরি হেরি থোর।
খনে আঁচর দএ খনে হোয় ভোর॥"

রাধার দেহে নামল যৌবনের ঢল। কিন্তু বালিকাসুলভ চাপল্যের অবসান হয়নি এখনো। অধরযুগল হাসিতে উজ্জ্বল। চোখের কোণে চাঞ্চল্যের ছোঁয়া লেগেছে। পুষ্পবনে এ যেন এক নবাগতা। আপন অঙ্গের পানে তাকান সুন্দরী। বিভোর হয়ে নিজ দেহের নবোদ্‌গত স্তবক পানে তাকিয়ে উন্মন হয়ে যান। মন ভ'রে রূপ ও রস পান করে করে কামনার কুঞ্জে কোকিলের কুহুতান শোনেন। প্রেমের কথা শুনলে উদ্‌গ্রীব নয়নে উৎকর্ণ হয়ে তাকিয়ে থাকেন। কেউ তা দেখলে মানভরে কান্না করুণ হাসির ছোঁয়া দিয়ে গালি মন্দ পাড়েন। মুকুর সম্মুখে রেখে কমল কলির মত মুখের সৌন্দর্য দেখেন। কেশ বিন্যাস করতে করতে সখীগণকে চুপি চুপি প্রেম-কথা নিবেদন করেন। হৃদয়ে প্রেমের উদয় হলে নয়ন মুদে ভাব-শান্ত হয়ে থাকেন। আবার রসের কথা কর্ণে এলে সঙ্গীতমুগ্ধা হয়ে হরিণীর মত সেদিক পানে আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। তাঁর মানসিক অবস্থা বড়ই খারাপ। সখী পরিবৃতা রাধিকা তাঁর অরক্ষিত কৌতূহল নিয়ে মরমে মরে যাচ্ছেন। আলুথালু কেশ। এলোমেলো বসন। শরীরের

একদিক ঢাকেন তো অপরদিক নগ্ন হয়ে পড়ে। এমনি সময় কৃষ্ণ এসে হাজির হলেন। রাধিকার সমস্ত অঙ্গ রক্তাভ ম্লান হয়ে গিয়েছে। লজ্জায় নতনেত্রে মৃত্তিকা পানে তাকিয়ে আছেন। পরে আবার সখীগণকে বলছেন—'আমার জীবন যৌবনে ধিক, আজ আমার মুক্ত অঙ্গ নগ্ন দেহ শ্রীহরি দর্শন করে গেলেন।

"কেলি রভস যব শুনে।
আনত হেরি ততহি দেই কাণে॥
ইথে যদি কোই করয়ে পরচারি।
কাঁদন মাখি হাসি দেই গারি॥"

*　　*　　*　　*

"মুকর লেই যব করত সিঙ্গার।
সখিরে পুছই কৈছে…বিহার॥"

*　　*　　*　　*

"শুনিতে রসের কথা থাপরে চিত।
যৈসে কুরঙ্গিণী শুনই সঙ্গীত॥"

*　　*　　*　　*

"একলি আছিনু ঘরে হীন পরিধান।
অলখিতে আওল কমল-নয়ান॥
এদিকে ঝাঁপিতে তনু ওদিকে উদাস।
ধরণী পশিয়ে যদি পাউ পরকাশ॥
ধিক যাউক জীবন যৌবন লাজ।
আজু মোর অঙ্গ দেখল ব্রজরাজ॥"

শ্রীহরি যাবেন মথুরায়। এ যেন রাধিকার কাছে দুঃসংবাদ বলে মনে হলো। তিনি ম্রিয়মাণ হয়ে পড়লেন। কৃষ্ণ এলে তাঁর কাছে দাঁড়িয়ে বেদনাহত রাধামন মৌন মিনতি নিবেদন করল—

"হিমকর-কিরণে নলিনী যদি জারব
কি করবি মাধবী মাসে॥
অঙ্কুর তপন তাপে যদি জারব
কি করব বারিদ-মেহে।"
"হরি হরি কো ইহ দৈব দুরাশা।
সিন্ধু নিকটে যদি কণ্ঠ সুখায়ব
কো দূর করব পিয়াস॥
চন্দন তরু যব সৌরভ ছোড়ব
শশধর বরিখব আগি।
চিন্তামণি যব নিজ গুণ ছোড়ব
কি মোর করম অভাগি॥
শ্রাবণ মহঘন বিন্দু না বরিখব
সুরতরু বাঁঝকি ছান্দে।"
সোহি কোকিল অব লাখ লাখ ডাকউ
লাখ উদয় করু চন্দা।
পাঁচ বান অব লাখ বান হউ
মলয় পবন বহু মন্দা।"

* * * *

"চীর চন্দন উরে হার ন দেলা।
সো অব নদী গিরি আঁতর ভেলা॥
পিয়াক গরবে হাম কাহুক ন গণলা।
সো পিয়া বিনা মোহে কে কিনা কহলা॥"

* * * *

"সজনি কো কহ আওব মধাঈ।
বিরহ পয়োধি পার কিএ পাওব
মঝু মনে নাহি পাতিয়াই॥

এখন তখন করি দিবস গোঙায়লুঁ
দিবস দিবস করি মাসা।
মাস মাস করি বরিখে গোঙায়লুঁ
ছোড়লুঁ জীবনক আশা॥"

এ পদগুলোর মধ্য থেকে আমরা কি পেলাম এবারে তাই নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক। প্রথমত, এ থেকে একটি কবি-মনের উৎকৃষ্ট বিকাশ কেমন করে ধাপে ধাপে ক্ষুদ্র থেকে বৃহতের মধ্যে বিস্তৃতি লাভ করেছে তাই দেখতে পাই। আর পাই কি? আর পাই কবির আভরণ-সজ্জিত ভাব-উৎকণ্ঠার বৈধব্য বেশ। বৈধব্য বেশ বলছি কেন এ নিয়েও হয়ত কথা উঠতে পারে। সে দিকটি সম্বন্ধে দু-দশটি কথা বলে নেওয়া ভালো।

বৈধব্য বেশ। কেন বৈধব্য বেশ? কি থেকে এ সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছানো যায়?

বিদ্যাপতির রাধিকার যৌবন-উন্মেষে আমরা কি দেখতে পেলাম, একবার সেদিকে দৃক্‌পাত করা যাক। রাধিকার বিরহ-ব্যথায় বিদীর্ণ মন। বিবেক-বিশ্বে বিলাপের অবকাশ। কিন্তু সে বেদনার মধ্যেও একটা গাম্ভীর্যপূর্ণ ঐশ্বর্যের স্পষ্ট ছাপ রয়েছে। কেবল যে শুধু কবি তার বর্ণনার চমৎকারিত্বে ঐশ্বর্যের প্রলেপ লাগিয়েছেন তা নয়—তার আবেগ-রুদ্ধ ভাবালু মনটাও সে শাক্ত-সত্তায় দীক্ষিত। অর্থাৎ রাধিকার আঁখিধার অথবা বেদনার বিলাপ আমাদের চোখে জল এনে দেয় বটে, কিন্তু তা আসে একটা শাশ্বত আনন্দের মহাসমুদ্র থেকে। সেখানে যেন আজন্মের উল্লাস। চিরন্তনের রস-মাধুর্য।

'এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর'

এ দুঃখের মাঝে একটি কাতরিমার কান্না আছে বটে। কিন্তু এ কান্নার সান্দ্র গাম্ভীর্যের মাঝ থেকে বিরহ-তাপিত চক্ষের একটি চপল অথচ

লাজসম্নত স্নিগ্ধ প্রাণ-জিজ্ঞাসা ফুটে ওঠে না কি? এ দুঃখ কিসের? প্রিয় বিরহের। সে বিরহ কাছে টানার আনন্দে দেহ-পিঞ্জরের মনো-সায়রে তুফান তুলে দিয়েছে। তাই রাধা অশ্রুসজলা। প্রলাপ-চপলা এ বেদনার মাঝে বক্ষদীর্ণ হাহাকার নেই। নেই প্রাণ-নিঙড়ানো ব্যথার বিষ-ধূম উদ্গীরণ। আছে আত্মরতির সুখসায়রে অবগাহনের একটা মানবিক আবেদন। কবি বিদ্যাপতিও সে দিকটি উপেক্ষা করে বাহ্যিক জগৎকে অস্বীকার করেননি। তিনি মানুষের মন-বেদনার সার্বিক রূপ দিয়ে সাজিয়েছেন বিরহ-তাপিতা কৃষ্ণ-পাগলিনী রাধিকাকে। তার হৃদ্-উদধির বুকে যে মিলন-লালসার লাস্য নৃত্য সুরু হয়েছে তারই বহিঃপ্রকাশ বিদ্যাপতির রাধিকার মুখ থেকে আমরা শুনতে পেলাম।

"ঝম্পি ঘন গর জন্তি সন্ততি
ভুবন ভরি বরিখন্তিয়া।
কান্ত পাহুন কাম দারুণ
সঘনে খর শর হন্তিয়া॥"

বিদ্যাপতির কবি-প্রকৃতি তাঁর শিক্ষা-দীক্ষা ও পরিবেশের 'পর অনেকটাই নির্ভরশীল ছিল। এই পরিবেশই তাঁকে মানব-মনের একটা সহজ সীমায় টেনে আনতে পেরেছে। চৈতন্য-পূর্ব যুগের কবি হয়ে তাঁর কণ্ঠে রাধার ভাব মহাভাবের বাণী প্রথমেই ধ্বনিত হয়ে ওঠেনি। তাঁকে এগিয়ে যেতে হয়েছে ধীরে ধীরে। ধাপে ধাপে। এ যেন ঠিক খাপে-আঁটা তলোয়ারের মত সুরক্ষিত সমাজ-বেষ্টনীতে আবদ্ধ। রাধার জন্ম অন্য কবি দিতে পারেন। কিন্তু রাধার দেখাশোনা, লালন-পালনের ভারটি ছিল বিদ্যাপতিরই। তাই তো দেখতে পাই বিদ্যাপতির রাধিকাকে লৌকিক বেশে। শুধু তাই নয়—এ রাধা নিয়মের রাজত্ব ছেড়ে সহসা একটা অনিয়মের রাজ্যে যোগিনী হয়ে আত্মরতির সায়র-তীর্থে তপমৌনা হয়ে বসতে পারেনি। কিন্তু চণ্ডীদাসের রাধা যেন জন্ম-যোগিনী।

ভাবুক মনে চণ্ডীদাস যমুনা-পুলিন হয়ে সমুজ্জ্বল। কিন্তু বিদ্যাপতি লৌকিক জীবনে রস-পরিবেশক হয়ে একটা নতুন ভুবন মিলিয়ে রাজসভা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন। এইখানেই দুই কবির প্রভেদ। চণ্ডীদাস ছড়িয়ে দিয়েছেন চন্দন-গন্ধা স্বর্গীয় নন্দনকাননের সুষমা। কিন্তু বিদ্যাপতি একেবারে প্রেমধর্মের বাল্য শিক্ষা খুলে দিয়ে ওমর খৈয়াম, কালিদাস অবধি একটা অখণ্ড সেতু নির্মাণ করে জয়দেবকেও সেখানে আমন্ত্রণ-লিপি পাঠিয়ে দিয়েছেন।

ক্রমে তাঁর অন্তরঙ্গতার রঙমহলের ঝাড়-লণ্ঠনগুলো এক এক করে নিভে গিয়ে আভাসিত হয়েছে স্বর্গীয় জ্যোতি। কিন্তু তা অনেক পরের কথা।

"সখি কি পুছসি অনুভব মোয়।
সোহি পিরীতি অনু- রাগ বখানি এ
তিলে তিলে নূতন হোয়॥
জনম অবধি হাম রূপ নেহারলুঁ
নয়ন না তিরপিত ভেল।
সোহি মধুর বোল শ্রবণহি শুনলুঁ
শ্রুতিপথে পরশ না গেল॥
কত মধুযামিনী রভসে সমালয়ঁ
না বুঝনু কৈছন কেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখলুঁ
তব হিয়া জুড়ন না গেল॥
কত বিদগধ জন রস অনুমগন
আনুভব কানু না পেখ।
কহ কবি বল্লভ প্রাণ জুড়াইতে
লাখে না মিলল এক॥"

'জনম অবধি হাম রূপ নেহারল' কেন তবুও মনের তন্‌হা মিটল না? কেন এখনও এত দর্শন-লালসা? এত বিস্ময়ই বা কিসের? কিসের জন্য স্পর্শমধুরে রতি বাসনার বিনীত প্রার্থনা? এর কোন সমাধান নেই কি?

যদি বলি না। তবে বোধ হয় তা অধিক বলা হবে না। কারণ মানব জীবনের এক অন্তরগূঢ় রহস্য লুকানো রয়েছে এই মিলনের মধ্যে। এ এক ছেদহীন অন্তহীন আনন্দ উপলব্ধির অজানিত তৃষা। যে নারী একদিন কোন এক মমতামধুর মুহূর্তে মিলনের সুখস্পর্শে, আকুল হয়ে গিয়ে দর্শন করেছিল পুরুষের রূপ, উপলব্ধির প্রাঙ্গণে বিছিয়েছিল আন্তরিকতার আসন এবং নয়নগোচর করেছিল তার অনন্ত প্রাণ, বিস্ময়টুকু—তাকে সে কেমন করে বিস্মৃতির অতল গহনে তালিয়ে দেবে? এ যে একটা চিরন্তন আত্মীয়তার নিবিড় বন্ধন সৃষ্টি হয়ে গিয়েছে। তাকে ভুলতে গেলে যে নিজেকেই হারিয়ে ফেলতে হয় তার মাঝে। শুধু হারিয়ে ফেলেই মুক্তি নেই। রভসমূর্চ্ছিতা রাধিকা রতির দহনে বিরতির তীর্থ-পীঠে দাঁড়িয়ে এক অনন্ত দীপদ্যুতি ছড়িয়ে দিয়ে তারই আরতির মাঝে নিজেকে বিলীন করে দিতে চলেছে। এর তো শেষ নেই। নেই অন্ত আর সীমা। এ এক অসীমের লীলাপথে চিরন্তনের ত্রিকালব্যাপী তন্‌হা। এর শেষ হয় না। শেষ হবে না। তাই তো রাধিকা নিখিলের ভক্ত-প্রাণ-প্রতিনিধি। তাঁর নয়ন, তাঁর হৃদয়, তাঁর মন ও প্রাণ চিরকাল চিরযুগ কৃষ্ণকরুণাপ্রার্থিনী হয়ে তাঁর পানেই তাকিয়ে থাকবে। নিখিল প্রাণের এ এক শাশ্বত বিকাশ। আজন্ম বিধুরতা।

উদ্‌ধৃত পদ থেকে বিদ্যাপতির কাব্যধারার ক্রম-বিকাশ আমরা অতি সুন্দরভাবে উপলব্ধি করতে পারি। তাই তো বলছিলাম—বিদ্যাপতির রাধা লৌকিক জীবন সুরু করে এসে উপস্থিত হয়েছেন অলৌকিক জীবনে। সেখানে রূপ অরূপের সীমা লঙ্ঘন করে একেবারে স্বরূপ

সাক্ষাতে তন্ময়। আভরণ নেই, আয়োজন নেই, আছে নিরাভরণা বেশ। কেবল এক বৃন্তে দুই কুসুমের মুখোমুখি বসবার একটি পরম লগন।

আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়লুঁ
পেখলুঁ পিয়ামুখ চন্দা।
জীবন যৌবন সফল করি মানলুঁ
দশ দিশ ভেল নিরনন্দা॥
আজু মঝু গেহ গেহ করি মানলুঁ
আজু মঝু দেহ ভেল দেহা।
আজু বিহি মোহে অনুকূল হোয়ল
টুটল সবলুঁ সন্দেহা॥
সোহি কোকিল অব লাখ লাখ ডাকউ
লাখ উদয় করু চন্দা।
পাঁচ বান অব লাখ বান হউ
মলয় পবন বহু মন্দা॥
অব মঝু বর পিয়া সঙ্গ হোয়ত
তবহু মানব নিজ দেহা।
বিদ্যাপতি কহ অলস ভাসি নহ
ধনি ধনি তুয়া নব লেহা॥

এ সুর যেন শ্রীরাধিকার অন্তর-নির্যাসের মধ্যে একটি সার্থক পরিণতি লাভ করতে পেরেছে। এ একেবারে হৃদয়ের মূল থেকে উৎসারিত হয়ে অনন্ত বস্তুর সন্ধানলাভে উল্লাসমুখর হয়ে উঠেছে। যাকে পাওয়া দুর্লভ, তাকে পেয়ে অমৃতত্বলাভের তৃপ্তিতে পরিতৃপ্ত অন্তর। বহু সাধনার ধন, বহু চোখের জলের মমতাময় আজ এসে তার দর্শন-তিতিক্ষাকেই শুধু পরিতৃপ্ত করেনি, একেবারে হৃদয় মন জুড়ে দেহ গেহর সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে এক স্বর্গীয় শান্তির সৌন্দর্যে অপরূপ হয়ে উঠেছে। এ যেন শিব ও শক্তির মিলন। পুরুষ ও প্রকৃতির দ্বৈত দিবিতিতে অদ্বৈত প্রকাশ। এক স্রোত। এক প্রবাহ। এক সুর।